Contents

Dr. Zakir Naik RochonaSomogro -1

Proshnottor Porbo

Islam Somporke Omuslimder Prosner Jobab

www.banglainternet.com

প্রশ্নোত্তর পর্ব

banglainternet.com

Contents

ইসলাম সম্পর্কে অমুসলিমদের প্রশ্নের জবাব

Replies To The Questions Regarding Islam Asked By Non-Muslim

banglainternet.com

Contents

সূচিপত্র

- প্রসঙ্গকথা –৪১৭
- আল কুরআন আল্লাহর বাণী –৪১৯
- ইসলামকে অনুসরণ করতে হবে কেন –৪২৪
- ইসলাম তরবারির জোরে প্রসার লাভ করেনি –৪৩৩
- মুসলমানরা সন্ত্রাসী নয় –৪৩৬
- মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার পার্থক্য –৪৪০
- ইসলাম ও মুসলিমদের অনুশীলনগত পার্থক্য –৪৪৩
- প্রসঙ্গ : শেষ নবী –৪৪৫
- প্রসঙ্গ : আখিরাত –৪৪৭
- প্রসঙ্গ : হিজাব –৪৫২
- প্রসঙ্গ : বহুবিবাহ –৪৫৮
- মিরাস বা উত্তরাধিকার আইন –৪৬৯
- সাক্ষ্যদানে নরনারীর অবস্থান –৪৭২
- মুসলমানরা কাবার পূজারী নয় –৪৭৬
- মক্কা-মদিনায় সংরক্ষিত প্রবেশাধিকার –৪৭৮
- পশু যবেহ করার ইসলামি পদ্ধতি –৪৭৯
- আমিষ খাদ্য গ্রহণ –৪৮১
- শূকরের মাংস হারাম –৪৮৭
- মদপান হারাম –৪৯০

প্রসঙ্গকথা

আধুনিক তথ্যপ্রবাহের অবিরত অসত্য প্রচারের কারণে অধিকাংশ অমুসলিমের মনে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমগুলোর প্রায় সবই নিয়ন্ত্রণ করে পাশ্চাত্য জগৎ। আন্তর্জাতিক স্যাটেলাইট চ্যানেল, রেডিও স্টেশন, খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, বই-পুস্তক যা-ই হোক না কেনো প্রায় সবগুলোই রয়েছে পশ্চিমাদের নিয়ন্ত্রণে। সাম্প্রতিককালে ইন্টারনেট একটি শক্তিশালী প্রচারমাধ্যম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। যদিও এটি বিশেষ কোনো পক্ষের একক নিয়ন্ত্রণে নেই। তারপরও এর মধ্যে একজন মানুষ ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক হিংসাত্মক ও বিভ্রান্তিকর প্রচারণা দেখতে পারে। ইদানিং মুসলামনরাও প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে ইসলামের সার্বিক ধারণা মানুষের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সীমিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু তা ইসলাম বিরোধী প্রচারণার তুলনায় একেবারেই নগণ্য। আশা করা যায় মুসলমানদের এ প্রচেষ্টা দিনে দিনে ব্যাপকতা লাভ করবে।

ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণার অপনোদনকল্পে স্থান, কাল ও পাত্রভেদে প্রশ্নসমূহ বাছাই করে নেয়া হয়েছে। কয়েক দশক আগেও প্রশ্নগুলোর আঙ্গিক ভিন্নতর ছিল, আর কয়েক দশক পরেও এগুলোর ধরন পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। এটা নির্ভর করবে প্রচারমাধ্যমগুলো কীভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করবে, তার ওপর।

banglainternet.com

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের লোকদের ইসলাম সম্পর্কে উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। আঞ্চলিক সংস্কৃতির পার্থক্যের কারণে হয়তো দু'একটি প্রশ্ন এর সাথে যুক্ত হতে পারে। যেমন আমেরিকার ক্ষেত্রে প্রশ্নটি যোগ হতে পারে যে, সুদ গ্রহণ ও প্রদানে ইসলাম নিষেধ করে কেনো?

সঙ্গত কারণেই ভারতের সামাজিক প্রেক্ষিতে উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর সাথে ভারতীয় অমুসলিমদের একটি প্রশ্ন যোগ করা হয়েছে। যেমন মুসলমানরা এতো আমিষ খায় কেন? অর্থাৎ তারা নিরামিষভোজী নয় কেন? এ প্রশ্নটি যোগ করার কারণ হলো, ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং তারা বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অর্থাৎ শতকরা ২০ ভাগ। অতএব তাদের প্রশ্নটি সাধারণ প্রশ্নগুলোর সাথে যুক্ত হওয়া খুবই প্রাসঙ্গিক।

ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করেছেন এমন অনেক অমুসলিম রয়েছেন। তবে তারা যা পড়ছেন তার অধিকাংশই পক্ষপাতদুষ্ট এবং ইসলামের বই-পুস্তকের সমালোচনায় মুখর। এসব অমুসলিম ব্যক্তিবর্গ উল্লিখিত সাধারণ প্রশ্নের সাথে আরো ভুল ধারণা থেকে উদ্ভূত কিছু প্রশ্ন সংযোজন করেন। তারা আল-কুরআনে পরস্পর বিরোধী কথা-বার্তা থাকার দাবি করেন এবং তারা আরো দাবি করেন যে আল-কুরআন অবৈজ্ঞানিক। উল্লিখিত পক্ষপাতদুষ্ট উৎস থেকে ইসলামকে যারা জানার চেষ্টা করেছেন তাদের ভুল ধারণা নিরসনে কিছু প্রচলিত প্রশ্নের উত্তরের সাথে এখানে বাড়তি কিছু উত্তর সংযোজিত হয়েছে।

আল কুরআন আল্লাহর বাণী

প্রশ্ন : আল কুরআন আল্লাহর বাণী তার প্রমাণ কী?

উত্তর : আল-কুরআন অবতীর্ণ হয় ১৪০০ বছর আগে, তখনই মুসলিম বিশ্ব হিদায়াতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। মুসলমানদের বিশ্বাসের অপরিহার্য অঙ্গ এই যে, আল-কুরআন আল্লাহর বাণী। এ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে সামান্যতম মতপার্থক্যও নেই। তারা বিশ্বাস করে যে, আল-কুরআনই ইসলামকে পূর্ণতা দান করেছে এবং এর হিফাযতকারী স্বয়ং আল্লাহ। মহান আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত এ কিতাবকে সংরক্ষণ করবেন কারণ কিয়ামত পর্যন্ত মানবতার জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব হিসেবে এ কিতাবের নির্দেশ ও বিধানই প্রযোজ্য।

মুহাম্মদ (স) বিশ্ব মানবতার জন্য রহমতস্বরূপ

মুহাম্মদ (স) মানবজাতির প্রতি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল। তিনি দুনিয়াবাসীর জন্য আল্লাহর এক বিরাট রহমতস্বরূপ। আল কুরআনে আল্লাহ বলেন–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ـ

অর্থ ঃ আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি।

(আল আম্বিয়া : ১০৭)

হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত রাসূল। তাই তাঁর বাণীও চিরস্থায়ী। অতএব তাঁকে প্রদত্ত মু'জিযা তথা অলৌকিক বিষয়গুলো চিরস্থায়ী এবং পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত এগুলোর কার্যকারিতা থাকবে। রাসূলুল্লাহ (স)কে প্রদত্ত অনেক অলৌকিক বিষয় বা ঘটনা রয়েছে, যাতে মুসলমানরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে।

কুরআন এক শ্রেষ্ঠ মু'জিযা

আল-কুরআন হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মদ (স)কে দেয়া চূড়ান্ত ও শ্রেষ্ঠ মু'জিযা। আল-কুরআন সর্বকালের জন্যই এক অনন্য সাধারণ মু'জিযা। আর এটা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে ১৪০০ বছর আগে।

banglainternet.com

উৎসের ক্ষেত্রে কুরআনের তিনটি ধারণা ও পরীক্ষা

মুহাম্মদ (স) নিজে কুরআন রচনা করেননি ঃ হযরত মুহাম্মদ (স) কখনো এ দাবি করেননি যে, আল-কুরআন তাঁর নিজের রচিত। তিনি সর্বদা এটাই বলেছেন যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত বাণী। তাঁর একথা অবিশ্বাস করার অর্থ তিনি মিথ্যা বলেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ ইতিহাস সাক্ষী যে, নবুয়ত লাভের পূর্বে ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি একটি মিথ্যাও বলেননি। তাঁকে মক্কার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে 'আল-আমিন' অর্থাৎ 'বিশ্বাসী' উপাধি দিয়েছিল। তৎকালীন আরবের সকল মানুষ তাঁকে একজন সৎ, আমানতদার ও সচ্চরিত্রের অধিকারী মহৎপ্রাণ ব্যক্তি বলেই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতো। অথচ নবুওয়াত লাভের পরপরই একদল স্বার্থান্বেষী মানুষ তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে অভিযুক্ত করে। এ অবস্থায়ও তাদের সকল মূল্যবান অর্থ-সম্পদ তাঁর কাছেই জমা রাখতো। অতএব এমন একজন অনুপম চরিত্রের মানুষ আল-কুরআনকে আল্লাহর বাণী এবং তিনি একজন নবী– এ সম্বন্ধে মিথ্যা দাবি করতে পারেন না।

কেবলমাত্র দুনিয়ার স্বার্থে অনেক লোকই নিজেকে সাধক পুরুষ, আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ বা প্রচারক হিসেবে দাবি করে এবং বিপুল সম্পদ অর্জন করে বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে পারে। যেমন– ভারতেও এরূপ লোকের সমাগম দেখা যায়। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (স) নবুওয়াত লাভের আগে অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেক সচ্ছল ছিলেন। তিনি নবুওয়াত লাভের ১৫ বছর আগে 'খাদীজা' নাম্নী এক ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বিয়ে করেন। অথচ নবুওয়াত লাভের পর তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা এমন হয়ে গিয়েছিল যে, মাসের পর মাস তাঁর চুলায় আগুন জ্বলেনি। কেননা তাঁর ঘরে রান্না করার মতো কিছু ছিল না। পানি, খেজুর এবং মদিনাবাসীদের দেয়া দুধ খেয়ে জীবনযাপন করতেন। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ (স) এর অনাড়ম্বর জীবনচিত্র। হযরত বিলাল (রা) যিনি তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন, তিনি বলেন, নবী করীম (স) যখনই কোনো দিক থেকে হাদীয়াস্বরূপ কিছু পেতেন, তা গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন এবং কখনো নিজের জন্য রেখে দিতেন না। তাঁর এ জীবনচিত্র থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বস্তুগত স্বার্থে কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারেন না।

অতএব আল-কুরআন আল্লাহর বাণী, যা তাঁর ওপর ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁর এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য।

কুরআন ওহীর মাধ্যমে মুহাম্মদ (স) এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে ঃ আল-কুরআন সম্পর্কে দ্বিতীয় ধারণা হলো হযরত মুহাম্মাদ (স) এটা অন্য ধর্মগ্রন্থ থেকে নকল করেছেন। অথবা এটা অন্য কোনো মানুষ থেকে সংগ্রহ করেছেন। একটি বিষয় বিবেচনা করলেই এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হবে। আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (স) উম্মী বা নিরক্ষর ছিলেন, এটা একটা ঐতিহাসিক সত্য। পবিত্র কুরআনেও এর সাক্ষ্য রয়েছে–

وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتٰبٍ وَّلَا تَخُطُّهٗ بِيَمِيْنِكَ اِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُوْنَ.

অর্থ : আপনি তো এর পূর্বে কোনো কিতাব পাঠ করেননি এবং স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কোনো কিতাব লেখেননি, এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা সন্দেহ পোষণ করত।

(সূরা আনকাবূত : ৪৮)

অতএব এটা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) আল-কুরআন অন্য কোনো উৎস তথা অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থ বা কোনো মানব উৎস থেকে সংগ্রহ করেননি, বরং এটা আল্লাহর বাণী, যা তিনি তাঁর রাসূল মুহাম্মদ (স) এর ওপর নাযিল করেছেন ওহীর মাধ্যমে।

আল-কুরআনে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে–

الٓمّٓ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ. اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اَتٰهُمْ مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ.

অর্থ : আলিফ, লাম, মীম; বিশ্বজগতের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এ গ্রন্থ অবতীর্ণ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা বলে, 'এতো তার নিজের রচনা।' বরং এটা আপনার পালনকর্তার থেকে আগত সত্য, যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারেন যাদের নিকট আপনার পূর্বে কোনো সতর্ককারী আসেনি। হয়ত তারা সৎ পথ পাবে। (সূরা সাজদা ঃ ১-৩)

আল-কুরআন সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর বাণী ঃ আল-কুরআনের উৎস সম্পর্কে তৃতীয় এবং সঠিক ধারণা হলো এটা কোনো মানুষ রচনা করেনি; বরং এটা মহাবিশ্বের স্রষ্টা, প্রতিপালক, পরিচালক ও মালিক মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর প্রিয়তম রাসূল মুহাম্মদ (স) এর প্রতি দুনিয়ার মানুষকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য প্রেরিত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব।

banglainternet.com

আল্লাহর কাছে 'দিন'-এর হিসাব

প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনের সূরা হাজ্জ-এর ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমার রবের একদিন তোমাদের হিসাবে হাজার বছরের সমান', এছাড়া সূরা সাজদাহ্‌র আয়াত নং ৫- এ উল্লেখ করা হয়েছে, 'তোমাদের প্রতিপালকের একদিনের পরিমাণ হবে তোমাদের হিসাবে হাজার বছরের সমান।' এরপর সূরা মাআরিজ ৪নং আয়াতে উল্লেখ আছে যে, ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিন যার পরিমাণ হবে পার্থিব ৫০,০০০ বছর। তাহলে আল্লাহর কাছে একদিন সমান কত হবে? পঞ্চাশ হাজার বছর না এক হাজার বছর?

উত্তর: ইন্টারনেটে এ প্রশ্নগুলো কমন। আপনাকে এগুলো জানার জন্য বিশেষজ্ঞ হতে হবে না। আপনি ইন্টারনেটে খোঁজ করুন। তালাশ করলে ইসলামবিরোধী সাইটগুলোতে এরকম আরো অনেক কিছুই পাবেন। তবে আমার দৃঢ় ধারণা আপনি পুরো কুরআন পড়েননি।

আপনি যদি সত্যটি জানতে চান তাহলে প্রথমে আপনাকে আসল উৎসটি পড়ে দেখতে হবে। যদি আপনি খ্রিস্টান সম্পর্কে জানতে চান এবং শুধু খ্রিস্টানদের বই পড়েন তাহলে আপনি একপেশে হয়ে যাবেন। যেহেতু আমি দাওয়ার কাজে নিয়োজিত, আমি বুঝি যে লোকজন প্রথমে ইসলামবিরোধী সাইটগুলো দেখে এবং মেনে নিয়ে ইসলামের বিপক্ষে চলে যায়। ইসলাম সম্পর্কে জানতে হলে ভালো সাইটগুলো ব্রাউজ করুন। আনসারিং ইসলাম টাইপের সাইটে যাবেন না।

কুরআনের দুটি আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, একদিনের সমান হলো একহাজার বছর। আর সূরা মাআরিজ-এর একটি আয়াতে উল্লেখ আছে, একদিনের সমান হলো পঞ্চাশ হাজার বছর। কথাগুলো কি পরস্পর বিরোধী নয়? এক আয়াতে বলা হয়েছে ১০০০ বছর অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ৫০,০০০ বছর।

যে শব্দের কারণে এ বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে আরবি ভাষায় সে শব্দটি হলো 'ইয়াওম'। ইয়াওমের দু'টি অর্থ আছে। একটি হলো 'দিন' যেমন– ২৪ ঘণ্টায় ১ দিন এবং অন্য অর্থটি একটি নির্দিষ্ট সময়কাল। একটি যুগ। এটি যেকোনো একটি সময়কাল হতে পারে। তাহলে ইয়াওমের একটি অর্থ দাঁড়াচ্ছে 'দিন' অন্যটি হচ্ছে সময়কাল। একটি আয়াত অনুযায়ী, একদিন সবকিছু আল্লাহ তা'আলার কাছে চলে যাবে। আর এই একটি দিন বা সময় তোমাদের দিনের হিসেবে এক হাজার বছর।

আবার সূরা মাআ'রিজ, আয়াত নং ৪ -এ উল্লেখ আছে 'ফেরেশতাগণ যখন আল্লাহর দিকে উর্ধ্বগামী হয় তখন যে সময়টি লাগে সেটি পার্থিব বছরের ৫০,০০০ বছরের সমান।'

বিষয়টি সহজে বোঝার জন্য আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি। ধরুন, আমি দুবাই থেকে আবুধাবি যেতে চাই, তাহলে ১ ঘণ্টা সময় লাগবে। আর যদি দুবাই থেকে আমেরিকা যেতে চাই সমগতিসম্পন্ন প্লেনে, তাহলে সময় লাগবে ৫০ ঘণ্টা। দুবাই থেকে আবুধাবি যেতে সময় লাগবে ১ ঘণ্টা এবং দুবাই থেকে নিউইয়র্ক যেতে আমার সময় লাগবে ৫০ ঘণ্টা। এটি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী কথা মনে হবে। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে পরস্পর বিরোধী নয়। কারণ এখানে উল্লিখিত দুটো ঘটনাই প্রকৃত অর্থে আলাদা। আপাত দৃষ্টিতে এইভাবে একদিন সবকিছু আল্লাহর কাছে যাবে, এবং অন্য একটি আয়াতের উল্লেখিত ফেরেশতাগণ তার কাছে যাবেন। এই ঘটনা দুটি ভিন্ন বিষয় এবং স্বতন্ত্র সময়কে নির্দেশ করে। কারণ এগুলো পরস্পর বিরোধী নয়। এখানে পুরো বিষয়টি আলাদা। তাই এখানে সময়ের হিসাবটিও ভিন্ন। আর একারণেই আপনি যদি অনুবাদ করতে গিয়ে ২৪ঘণ্টায় ১ দিন হিসাবে গণ্য করেন তবে তা হবে পরস্পর বিরোধী আর আপনি যদি অনুবাদ করেন এটি একটি সময়কাল, যেমন আল্লাহ বলেছেন, তিনি এই পৃথিবীমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন মোট ৬ দিনে অর্থাৎ ৬টি আইয়্যামে তাহলে তা হবে সঠিক।

বস্তুত এই ৬টি সময়কাল ৬টি যুগ। বিজ্ঞানীদেরও এ বিষয়ে কোনো আপত্তি নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এখানেও 'ইয়াওম' এর অর্থ একটি সময়কাল। তবে এই উত্তরগুলোর জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে যেতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইটের ঠিকানা হচ্ছে– www.irf.net। ইনশাআল্লাহ বেশির ভাগ প্রশ্নের উত্তরই সেখানে পাবেন। আশা করি আপনার উত্তরটি বুঝে নিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, স্যার তাহলে এখানে দুটি জিনিস ভিন্ন? হ্যাঁ, তাই। কারণ এখানে ইয়াওমের বহুবচন হলো আইয়্যাম। এখানে একটি সময়কালকে বোঝাচ্ছে, যা হতে পারে ১ বছর, ১ হাজার বছর, ১ কোটি বছর অথবা যে কোনো সময়কাল।

banglainternet.com

ইসলামকে অনুসরণ করতে হবে কেন

প্রশ্ন : মৌলিকভাবে সব ধর্মই তার অনুসারীদের সৎকাজের নির্দেশ দেয়, তাহলে একজন লোককে শুধু ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করে চলতে হবে কেন? সে কি অন্য কোনো ধর্ম মেনে চলতে পারে না?

উত্তর : সব ধর্মই মানুষকে মন্দ থেকে বেঁচে থেকে সৎপথে চলার পরামর্শ দেয়। তবে ইসলামে এর বাইরে কিছু রয়েছে। ইসলাম আমাদেরকে ন্যায় ও সত্য পাওয়ার জন্য এবং মন্দকে দূর করার জন্য আমাদের ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে সামষ্টিক জীবনে ব্যবহারিক পন্থা অনুসরণ করার দিক-নির্দেশনা দেয়। ইসলাম মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি ও তার সমাজের জটিলতাকে বিবেচনায় রাখে। ইসলাম হলো স্বয়ং স্রষ্টার পক্ষ থেকে দিকনির্দেশ। সুতরাং ইসলামকে 'দ্বীনুল ফিতরাহ' 'তথা মানুষের স্বভাবজাত জীবনব্যবস্থা' বলা হয়।

ইসলামে ভারসাম্য নীতি

উদাহরণ ১ ঃ ইসলাম আমাদের ডাকাতি ও রাহাজানি দূর করতে নির্দেশ দেয়, সাথে সাথে ডাকাতি ও রাহাজানি দূর করার পদ্ধতিও বাতলে দেয়।

ইসলামে রয়েছে ডাকাতি ও রাহাজানি নির্মূলের পদ্ধতি

সব কটি প্রধান ধর্মই চুরি ও ডাকাতিকে একটি মন্দ কাজ বলেই শিক্ষা দিয়ে থাকে; ইসলামও একই শিক্ষা দেয়। সুতরাং ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, সত্যি বলতে কি ইসলাম 'চুরি-ডাকাতি একটি মন্দ কাজ' এ শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে এমন একটি সমাজ গড়ার ব্যবহারিক পদ্ধতি দেখিয়ে দেয়, যেখানে মানুষ চুরি-ডাকাতি করবে না।

ইসলামে রয়েছে যাকাতের বিধান

ইসলাম কল্যাণধর্মী যাকাতের বিধান বাস্তবায়নের নির্দেশ দান করে। এটি বাধ্যতামূলক বার্ষিক একটি দান বিশেষ। ইসলামী আইনের বিধান হলো– এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যার সঞ্চিত সম্পদের পরিমাণ 'নিসাব' পর্যন্ত পৌঁছে অর্থাৎ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মূল্য পরিমাণ অথবা ৫২.৫ তোলা রৌপ্যের মূল্য পরিমাণ পৌঁছে, তাকে প্রতি চান্দ্র বছরে বাধ্যতামূলকভাবে তার সঞ্চিত সম্পদের ২.৫% ভাগ যাকাত দিতে হবে। এ বিধান অনুসারে যদি বিশ্বের প্রতিটি ধনী লোক যথাযথভাবে হিসাব করে যাকাত দেয়, তাহলে সমগ্র বিশ্ব থেকে দারিদ্র্য নির্মূল হয়ে যাবে। এর ফলে পৃথিবীতে একটি মানুষও অনাহারে মারা যাবে না।

চুরি-ডাকাতির শাস্তির বিধান হাত কেটে দেয়া

ইসলাম চুরি-ডাকাতি বন্ধ করার জন্য চোর-ডাকাতের হাত কেটে দেয়ার বিধান পেশ করে। কুরআন মাজীদের সূরা আল-মায়েদায় আল্লাহ তাআলা বলেন–

اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

অর্থ ঃ চুরি সংঘটনকারী পুরুষ এবং নারী, উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের দণ্ডরূপে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত শাস্তিস্বরূপ। আল্লাহ পরাক্রমশালী, মহা প্রজ্ঞাময়। (সূরা মায়েদা : ৩৮)

অমুসলিমরা বলতে পারে যে 'এ বিংশ শতাব্দীতে হাত কাটা–ইসলাম একটি বর্বর ও নিষ্ঠুর ধর্ম।'

ইসলামী শরীআ আইনে রয়েছে সুফল

ধরে নেয়া যাক, আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত একটি রাষ্ট্র। দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেখানে বিশ্বের সবচেয়ে অধিক হারে অপরাধ সংঘটিত হয় চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে। মনে করুন আমেরিকাতে ইসলামী শরীয়তের আইন জারি করা হলো। উদাহরণস্বরূপ, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি যাকাত (সঞ্চিত সম্পদের ২.৫% অর্থাৎ ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের উপরে চান্দ্র-বার্ষিক বাধ্যতামূলক দান) দেয় এবং প্রত্যেক সাজাপ্রাপ্ত পুরুষ বা মহিলার হাত কেটে দেয়া হয়, তাদের অপরাধের শাস্তি হিসেবে। এখন বলুন, অতঃপর আমেরিকাতে চুরি-ডাকাতি বাড়বে না-কি একই থাকবে অথবা কমে যাবে? স্বভাবত এটা কমে যাবে। এ ধরনের কঠিন আইন জারি থাকলে অনেক স্বভাবগত অপরাধী নিজেকে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হবে। ফলে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য চোরও নিজেকে সংশোধন করে নেবে এবং চুরি ও ডাকাতি নির্মূল হয়ে যাবে।

আমি বিশ্বাস করি বর্তমান বিশ্বে চোর-ডাকাতের যে বিশাল সংখ্যা রয়েছে তাতে যদি তাদের হাত কাটা হয় তাহলে দেখা যাবে পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ লোকের হাত কাটা। তবে ব্যাপারটা হলো– যখনই হাত কাটার বিধান জারি হবে, তার পরমুহূর্ত থেকেই চুরি-ডাকাতির সংখ্যা কমে যাবে। পেশাধারী চোরও এ পথে পা বাড়াবার আগে একবার পরিণতির কথা ভেবে দেখবে যে, ধরা পড়লে তার পরিণতি কেমন হবে। শাস্তির ভয়াবহতাই অধিকাংশ চোর-ডাকাতের ইচ্ছাকে দমন করার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর নিতান্ত দুর্ভাগা ছাড়া এ পেশায় কেউ টিকে থাকবে না। অতএব

banglainternet.com

একান্ত নগণ্য সংখ্যক লোকের হাত-ই শুধু কাটা যাবে। ফলে কোটি কোটি লোক চুরি-ডাকাতির ভয় থেকে নিরাপত্তা পেয়ে শান্তিতে বাস করবে। আর চুরি-ডাকাতি বন্ধ হওয়ার ফলে অনেক চোর হাত কাটা যাওয়া থেকে বেঁচে যাবে। অতএব ইসলামী আইন অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও ফলপ্রসূ।

উদাহরণ ২ ঃ ইসলাম উৎপীড়ন ও ধর্ষণের মত জঘন্য কাজকে নিষিদ্ধ করেছে। 'হিজাব' বা পর্দাকে বিধিবদ্ধ করেছে এবং প্রমাণিত ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দিয়েছে :

নারী পীড়ন নির্মূলের পদ্ধতি দিয়েছে ইসলাম

সব কটি প্রধান ধর্মই নারী-উৎপীড়ন ও ধর্ষণকে জঘন্য পাপ বলে ঘোষণা করেছে। ইসলামের শিক্ষাও তাই। তাহলে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য হলো– ইসলাম নারীদের মর্যাদা রক্ষার উপদেশ দিয়ে এবং নারীদেরকে উৎপীড়ন ও ধর্ষণকে জঘন্য অপরাধ বলে ঘোষণা দিয়েই থেমে থাকেনি; বরং সমাজ থেকে এ জঘন্য অপরাধ যাতে নির্মূল হয়ে যায় তার পরিষ্কার দিকনির্দেশনা দিয়েছে।

প্রথমে পর্দা পুরুষের জন্য

পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলামে রয়েছে পর্দার বিধান। ইসলাম প্রথমে পুরুষের জন্য পর্দার কথা ঘোষণা করেছে। অতঃপর ঘোষণা করেছে নারীর পর্দার কথা। পবিত্র কুরআনের সূরা নূর-এর ৩০ নং আয়াতে পুরুষের পর্দার কথা ঘোষিত হয়েছে–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۔ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ۔ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۔

অর্থ : আপনি মু'মিন পুরুষদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে, নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত।

পুরুষের দৃষ্টি নারীর প্রতি পড়লে তার মনে কোনো অশ্লীল ও লজ্জাকর চিন্তা এসে যেতে পারে, তবে সেকারণে তাৎক্ষণিকভাবে তার দৃষ্টি নামিয়ে নেয়া উচিত।

নারীর জন্য হিজাব

এ আয়াতে নারীর পর্দার কথা উল্লেখ করা হয়েছে–

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ

banglainternet.com

زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۔

অর্থ : আর আপনি ঈমানদার নারীদের বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে এবং তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, আর তারা যেন তাদের চাদর স্বীয় বক্ষের ওপর জড়িয়ে রাখে। আর তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য কারো কাছে প্রকাশ না করে কিন্তু তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের পুত্র, তাদের স্বামীদের পুত্র, তাদের ভাই, তাদের ভ্রাতুষ্পুত্র, তাদের ভগ্নি পুত্র, আপন স্ত্রীলোক, নিজেদের মালিকানাধীন দাসী, যৌন কামনামুক্ত নিষ্কাম পুরুষ এবং এমন বালক যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ ব্যতীরেকে; আর তারা যেন নিজেদের গোপন সাজ সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যেন তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।

(সূরা, নূর– ২৪ : ৩১)

নারীর জন্য বর্ধিত 'হিজাব' তথা পর্দা হলো তার পুরো শরীর (ঢিলে ঢালা) পোশাক দ্বারা ঢাকা থাকতে হবে, কেবল মুখমণ্ডল কব্জী পর্যন্ত দু'হাত খোলা থাকবে। তবে তারা যদি চায় তা-ও ঢেকে নিতে পারে। ইসলামী আইনের কিছু বিশেষজ্ঞ মুখমণ্ডল ঢাকার ওপর জোরও দিয়েছেন।

হিজাব নারীকে সুরক্ষা দেয়

আল্লাহ তাআলা নারীর জন্য পর্দার বিধান কেন দিয়েছেন– তার কারণ সূরা আহযাবের নিচের আয়াতে উল্লেখ করেছেন–

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۔

অর্থ : হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও বিশ্বাসীদের রমণীগণকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ ওপরে টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে; তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(সূরা আহযাব : ৫৯)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বলে যে, নারীর জন্য 'হিজাব' এর বিধান দেয়া হয়েছে, যাতে তারা সম্ভ্রান্ত মহিলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এটা তাদেরকে উত্যক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করবে।

দু'বোনের উদাহরণ

ধরা যাক, দু বোন যমজ এবং তারা উভয়েই সুন্দরী; তারা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের একজন ইসলামী 'হিজাব' বা পর্দাবৃতা অর্থাৎ মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দু'হাত ছাড়া সমস্ত শরীর ঢাকা। অন্য যমজ বোনটি মিনিস্কার্ট বা শর্টস (সংক্ষিপ্ত পোশাক) পরিহিতা। রাস্তার মোড়ে এক বখাটে যুবক যে কোনো মেয়েকে উত্যক্ত করার সুযোগ খুঁজে ফিরছে। বলুন তো বখাটে যুবকটি কোন মেয়েটিকে উত্যক্ত করবে? যে মেয়েটি ইসলামী 'হিজাব' ঢাকা তাকে, না-কি যে মেয়েটি মিনি স্কার্ট বা শর্টস্ পরা তাকে? নিশ্চয়ই দ্বিতীয় জনকে, যেহেতু তার পোশাক দ্বারাই বিপরীত লিঙ্গকে উত্যক্ত করা ও ধর্ষণ করার আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদ যথার্থই বলেছে যে, পর্দা নারীদেরকে পুরুষের নির্যাতন থেকে রক্ষা করে।

ইসলামে ধর্ষকের জন্য চরম শাস্তি

ইসলামী শরীআ আইন প্রমাণিত ধর্ষকের জন্য চরম শাস্তি নির্ধারণ করেছে। আধুনিক যুগে এ ধরনের কঠোর শাস্তির কথা শুনে অমুসলিমরা ভীত হয়ে পড়তে পারে। অনেকে ইসলামকে নিষ্ঠুর বর্বরতার দোষে দোষারোপ করতে পারে। আমি শত শত অমুসলিম পুরুষকে একটি প্রশ্ন করেছি। ধরা যাক, আল্লাহ ক্ষমা করুন, কোনো নরাধম আপনার স্ত্রী, মাতা এবং কন্যাকে ধর্ষণ করেছে। আপনি বিচারকের আসনে উপবিষ্ট, ধর্ষককে আপনার সামনে আনা হয়েছে। আপনি তাকে কী শাস্তি দেবেন? প্রশ্নকৃত সবাই বলেছে যে, 'আমরা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেবো।' কিছু লোকতো এমনও বলেছে যে, 'আমরা তাকে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে মারবো।' এখন প্রশ্ন হলো, আপনি আপনার স্ত্রী, মাতা ও কন্যার ধর্ষককে মৃত্যুদণ্ড দেবেন, কিন্তু অপর কারো স্ত্রী, মাতা ও কন্যার ধর্ষকের জন্য নির্ধারিত শাস্তিকে আপনি বর্বরতা বলবেন কোন্ যুক্তিতে?

ধর্ষণের সর্বোচ্চ রেকর্ড আমেরিকায়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলোর অন্যতম। ১৯৯০ সালের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এফবিআই-এর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, সে দেশে উক্ত বছরে ১,০২,২৫৫টি ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। ধর্ষণের সঠিক সংখ্যা নির্ণয়

banglainternet.com

করার জন্য নথিভুক্ত সংখ্যাকে ৬.২৫ দিয়ে গুণ করলে দাঁড়ায় ৬,৪০,৯৬৮। এটা হলো আমেরিকায় ১৯৯০ সালে সংঘটিত ধর্ষণের ঘটনা। মোট সংখ্যাকে ৩৬৫ দিয়ে ভাগ করে আমরা পাই ১,৭৫৬ যা সেই দেশে দৈনিক গড়ে সংঘটিত ধর্ষণের ঘটনা। পরবর্তী অন্য একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, আমেরিকাতে গড়ে দৈনিক ১৯০০ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে থাকে। ন্যাশনাল ক্রাইম ভিকটিমাইজেশন সার্ভে ব্যুরো অব জাস্টিস স্ট্যাটিসটিকস (ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস)-এর পরিসংখ্যান অনুসারে শুধু ১৯৯৬ সালেই ৩,০৭০০০ ধর্ষণের ঘটনা নথিভুক্ত করা হয়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রকৃত ঘটনার সর্বোচ্চ ৩১% ঘটনায় অভিযোগ দায়ের করা হয়ে থাকে। বাকি ঘটনার অভিযোগ না করে নীরব থাকা হয়। অতএব ৩,০৭০০০×৩,২২৬ = ৯,৯০,৩২২টি ধর্ষণের ঘটনা ১৯৯৬ সালে আমেরিকাতে সংঘটিত হয়েছে। তাহলে ১৯৯৬ সালে আমেরিকাতে গড়ে দৈনিক ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৯,৯০,৩২২ ÷ ৩৬৫ = ২,৭১৩টি। উক্ত বছরে প্রতি ৩২ সেকেন্ডে একটি করে ধর্ষণের ঘটনা সেখানে সংঘটিত হয়েছে। সম্ভবত আমেরিকান ধর্ষকেরা ক্রমান্বয়ে হিংস্র হয়ে উঠছে। এফ.বি.আই-এর ১৯৯০ সালের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে নথিভুক্ত ঘটনায় ১০% ধর্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্ষণের ঘটনার মোট সংখ্যার মাত্র ১.৬% ধর্ষকের শাস্তি হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের ৫০% অপরাধী বিচার কর্ম শুরু হওয়ার আগেই ছাড়া পেয়ে যায়। এতে গ্রেফতারকৃতদের কেবল ০.৮% অপরাধী বিচারের সম্মুখীন হয়। অন্য কথায় কোনো অপরাধী যদি ১২৫টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটায়, তাহলে তার সাজা পাবার আশঙ্কা মাত্র একটি ঘটনায়। অনেক ধর্ষক এটাকে একটা নিশ্চিন্ত বাজি ও জুয়ার মতো ধরে নিতে পারে। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, যেসব অপরাধী বিচারের সম্মুখীন হয়, তাদের ৫০% এর শাস্তি হয় এক বছরেরও কম সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে। যদিও আমেরিকার আইনে ধর্ষণের শাস্তি ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমেরিকার বিচারকরা প্রথমবার ধর্ষকের প্রতি নমনীয় রায় দেন। চিন্তা করে দেখুন, কোনো ব্যক্তি ১২৫ বার ধর্ষণের পর মাত্র একবার সাজাপ্রাপ্ত হয় এবং ৫০% ধর্ষকের প্রতি বিচারকরা নমনীয় রায় দেন অর্থাৎ ১ বছরের কম সময়ের কারাদণ্ড দেন।

ইসলামী শরীআ আইনে রয়েছে নিশ্চিত সুফল

মনে করুন, আমেরিকাতে ইসলামী আইন জারি হয়েছে। কোনো পুরুষের দৃষ্টি কোনো নারীর প্রতি পড়লে সে তার মনে কোনো কুচিন্তা আসার আশঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গেই তার দৃষ্টি নামিয়ে নিচ্ছে। নারীরা ইসলামী 'হিজাব'-এর বিধান মেনে চলছে

অর্থাৎ মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত ছাড়া সর্বাঙ্গ ঢেকে চলাফেরা করছে। এর পরেও যদি কোনো ব্যক্তি ধর্ষণের ঘটনা ঘটায়, তাকে চরম শাস্তি 'মৃত্যুদণ্ড' দেয়া হচ্ছে। এ অবস্থায় কোনো মতেই ধর্ষণের অপরাধ বাড়তে তো পারেই না; এমনকি স্থিরও থাকতে পারে না; বরং এ অপরাধ কমতে বাধ্য।

ইসলামে রয়েছে মানবীয় সমস্যার বাস্তবমুখী সমাধান

ইসলাম মানবজাতির জন্য সর্বোত্তম জীবনব্যবস্থা। কারণ এ বিধানসমূহ কেবল এক বাস্তবমুখী তত্ত্বগত বুলি নয়; বরং তা হচ্ছে মানবসন্তানদের সন্তানদের কল্যাণধর্মী বিধান। ইসলামের বিধানসমূহ যেমন ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর, তেমনি সামষ্টিক পর্যায়েও এ বিধানসমূহ অনন্য কল্যাণকর ব্যবস্থা। ইসলাম সর্বকালের সকল মানুষের জন্য সর্বোত্তম জীবনব্যবস্থা, কারণ এটা সবচেয়ে বাস্তবমুখী, বিশ্বজনীন ব্যবস্থা, যা বিশেষ কোনো জাতি-গোষ্ঠির জন্য নির্ধারিত নয়।

দাওয়াতে দ্বীন একটি অর্পিত দায়িত্ব

মুসলমান মাত্রই জানেন ইসলাম একটি বিশ্বজনীন জীবনব্যবস্থা। এটি মনোনীত করা হয়েছে মানবজাতির জন্য। মহান আল্লাহ বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। গোটা মানব সম্প্রদায়ের কাছে আল্লাহ তাঁর বাণী পৌছানোর দায়িত্বে মুসলমানদের নিয়োজিত করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে তারা তাদের সে দায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিফহাল নয়। মুসলিমদের উচিত জীবনযাত্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের অনুসরণ করা এবং অন্যকে দাওয়াত দেয়া। অথচ অধিকাংশ মুসলমানই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অমুসলিমদের কাছে ইসলামের বাণী পৌছে দিতে যত্নবান নয়। কিন্তু এরূপ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আল্লাহ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এ সম্পর্কে কুরআন মাজিদে সূরা বাকারার ১৪০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

অর্থ : তার চেয়ে অত্যাচারী কে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে প্রমাণিত সাক্ষ্যকে গোপন করে? আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।

ইসলামের ছায়াতলে পৌছার লক্ষ্যে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কানুষ্ঠান কাঙ্ক্ষিত ও অনুমোদিত পদ্ধতি– একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে–

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.

banglainternet.com

অর্থ : আপনি মানুষকে আপনার প্রতিপালকের পথের প্রতি ডাকুন হিকমত সহকারে ও উত্তম উপদেশ দিয়ে এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন।

কোনো অমুসলিম ব্যক্তির কাছে শাশ্বত বাণী পৌছানোর ব্যাপারে ইসলামের ইতিবাচক দিকগুলো উপস্থাপন করাই যথেষ্ট নয়। ইসলামের শাশ্বত বিষয়গুলোর সাথে অধিকাংশ অমুসলিম একমত পোষণ করতে পারে না। এর কারণ হলো, ইসলাম সম্পর্কে তাদের মনের গভীরে বেশ কিছু প্রশ্ন থাকে যার উত্তর তারা অবহিত নয়।

ইসলামের কল্যাণকর বিভিন্ন ইতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে আপনার যুক্তির সাথে তারা একমত হলেও পরক্ষণেই বলবে, 'ওহ, তোমরা তো সেই মুসলমান যারা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে থাক। তোমরা তো সেই লোক যারা নারীদেরকে পর্দার নামে চার দেওয়ালে বন্দি করে রাখ। তোমরা তো মৌলবাদী, ইত্যাদি ইত্যাদি।'

ব্যক্তিগতভাবে আমি অমুসলিমদের দৃঢ়ভাবে বলতে চাই ইসলাম সম্পর্কে তারা যা ধারণা করে তা সম্পূর্ণ ভুল। এ সম্পর্কে তাদের ধারণা একেবারেই সীমিত, তা হোক ভুল কিংবা শুদ্ধ; অথবা যে উৎস থেকেই তা গৃহীত হোক না কেনো। আমি সরাসরি বলতে চাই ইসলাম সম্পর্কে তাদের 'ধারণা' আর 'অনুভূতি' একেবারেই ভুল।

বিগত কয়েক বছরের দাওয়াতী কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে আমি অনুধাবন করেছি, একজন সাধারণ অমুসলিম ব্যক্তির মনে ইসলাম সম্পর্কে অনেকগুলো প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। আপনি যখন অতি সাধারণ একজন অমুসলিমকে জিজ্ঞেস করবেন, 'তোমার মতে ইসলামে কী কী ভুল রয়েছে?' সে তখন পাঁচ কি ছয়টি প্রশ্ন করতে পারবে যেগুলো এ আলোচনায় বিশটি সাধারণ প্রশ্নের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

যুক্তি-প্রমাণ ও উদাহরণসহ অমুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নসমূহ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। অধিকাংশ অমুসলিম-ই এসব উত্তরে আশ্বস্ত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। যদি কোনো মুসলমান এ উত্তরগুলো মুখস্থ ও আত্মস্থ করার চেষ্টা করেন, তাহলে ইনশাআল্লাহ তিনি সফল হবেন। এক্ষেত্রে কোনো অমুসলিম ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সত্যকে যদি গ্রহণ না-ও করে, অন্ততপক্ষে ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণাসমূহ দূর হবে। ইসলাম সম্পর্কে তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে নিরপেক্ষ অবস্থানে অবশ্যই নিয়ে আসতে সক্ষম হবে। একেবারে হাতে গোনা কিছু সংখ্যক অমুসলিম এসব উত্তরের বিপক্ষে পাল্টা যুক্তি পেশ করতে সক্ষম হতে পারে, যার জন্য অতিরিক্ত তথ- প্রমাণ ও বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন।

'গড' নয় 'আল্লাহ' কেন

প্রশ্ন : কেন মুসলিমরা গডকে আল্লাহ বলে?

উত্তর : গডকে মুসলমানরা আল্লাহ বলে কেন, এ প্রশ্নের জবাব জানতে হলে প্রথমে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে জানতে হবে। পবিত্র কুরআনের সূরা ইখলাসে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ব্যক্ত করা হয়েছে।

আল্লাহর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - বলুন, তিনি আল্লাহ একক (অদ্বিতীয়)।

২. اَللّٰهُ الصَّمَدُ - আল্লাহ মুখাপেক্ষিহীন।

৩. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ - তিনি কাউকে জন্মদান করেননি, কারো থেকে তিনি জন্মগ্রহণ করেননি।

৪. وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। *(সূরা ইখলাস : ১-৪)*

সূরাটির দ্বিতীয় আয়াতে উল্লিখিত 'আস-সামাদ' আরবি শব্দটির যথার্থ অনুবাদ একটু কঠিন। তবে এর মূল অর্থের কাছাকাছি অর্থ হলো Absolute existence অর্থাৎ পরম অস্তিত্ব। এই বিশেষণটি একমাত্র আল্লাহর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; কেননা অন্য সকল কিছুর অস্তিত্ব অস্থায়ী ও শর্তসাপেক্ষ। এ শব্দ দ্বারা এ অর্থ প্রকাশিত হয় যে, আল্লাহ কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর নির্ভরশীল নন বরং সকল ব্যক্তি বা বস্তু তাঁর ওপরই নির্ভরশীল এবং তাঁরই মুখাপেক্ষী।

গডকে আল্লাহ বলার কারণ

'God' ইংরেজি শব্দ, এর আরবি প্রতিশব্দ 'আল্লাহ'। ইংরেজি 'God' শব্দের সাথে যদি S যোগ করেন তাহলে শব্দটি হবে 'Gods'. এটি গডের বহুবচন। কিন্তু আল্লাহর কোনো বহুবচন নেই। কুরআন বলছে আল্লাহ এক এবং একক। আবার আপনি যদি গডের পর ess যোগ করেন তহলে শব্দটি হবে 'Godess' অর্থাৎ, মহিলা 'গড'। কিন্তু আল্লাহর কোনো লিঙ্গ নেই। অধিকন্তু আপনি যদি 'god' লিখেন অর্থাৎ ছোট হাতের g ব্যবহার করেন, তাহলে এর অর্থ হবে 'নকল খোদা'। কিন্তু ইসলামে কোনো নকল খোদা নেই। যদি আপনি গডের সাথে 'ফাদার' যোগ করেন, তা হলে শব্দটি হবে 'God father'. অথচ আপনি আল্লাহর সাথে 'ফাদার' কিংবা 'আব্বা' যোগ করতে পারেন না। অনুরূপভাবে যোগ করতে পারেন না 'Mother' শব্দটিও। কারণ, আম্মি-আল্লাহ বলা ইসলামের পরিপন্থি। ইসলামে আম্মি আল্লাহ বলে কিছু নেই। এরপর যদি 'Tin শব্দটি যোগ করেন, তাহলে এর অর্থ হবে 'বাতিল আল্লাহ'। কিন্তু এটা ইসলামি আকীদার পরিপন্থী। সুতরাং একজন মুসলিমের জন্য আল্লাহকে God বলা যৌক্তিক নয়। এটা বিশ্বাসের পরিপন্থী।

banglainternet.com

ইসলাম তরবারির জোরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি

প্রশ্ন : ইসলামকে শান্তির ধর্ম কীভাবে বলা যায়, অথচ তা প্রসার লাভ করেছে তরবারির জোরে?

উত্তর : অমুসলিমদের একটি সাধারণ অংশের ধারণা যে, ইসলাম বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি অনুসারী পেতে সক্ষম হতো না যদি শক্তি প্রয়োগে প্রসার লাভ না করতো। ইসলাম যে ভয় দেখিয়ে তরবারির সাহায্যে প্রসার লাভ করেনি আলোচনা থেকে তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। সত্যের স্বাভাবিক ও সহজাত প্রভাব, এক অপরিহার্য কার্যকারণ ও মানব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল যৌক্তিকতা ইসলামকে দ্রুত প্রসার লাভে সহায়তা দান করেছে। ইসলাম একটি মানব প্রকৃতির ধর্ম।

ইসলাম অর্থ শান্তি ঃ 'ইসলাম' শব্দের মূল হচ্ছে সিলমুন (سِلْمٌ) যার অর্থ শান্তি। এর অপর অর্থ আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ। সুতরাং ইসলাম হলো শান্তির ধর্ম যা মহান স্রষ্টা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে অর্জিত হয়।

শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় কখনো শক্তির প্রয়োজন

বিশ্বের সকল মানুষ শান্তি-শৃঙ্খলার পক্ষে নয়। অনেক মানুষ আছে যারা নিজেদের হীন স্বার্থে অনাচার সৃষ্টির মাধ্যমে শান্তি-শৃঙ্খলায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। তাই কখনো কখনো শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। আর এ সুনির্দিষ্ট কারণেই আমাদের পুলিশ বাহিনী রয়েছে যারা দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দুষ্কৃতকারী ও সমাজ বিরোধী লোকদের মোকাবিলায় শক্তি প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়। ইসলাম শান্তির প্রযোজক, সাথে সাথে ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করে। অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে অনেক সময় শক্তি প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ইসলাম শুধু শান্তি-শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার খাতিরেই শক্তি প্রয়োগ করার অনুমতি দেয়।

ঐতিহাসিক ডি ল্যাসীও ল্যারী-এর অভিমত

তরবারির জোরে ইসলাম প্রসার লাভ করছে- এ ভুল ধারণার উত্তম জবাব দিয়েছেন বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ডি ল্যাসীও ল্যারী (De Lecyo Leary)। তিনি তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইসলাম এট দি ক্রস রোড' (Islam at the cross road) নামক গ্রন্থে উল্লিখিত অভিযোগের সন্তোষজনক জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

'ইসলামকে নিয়ে ধর্মান্ধ মুসলমানরা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং ইসলামকে তরবারির অগ্রভাগে নিয়ে বিজিত জাতিগুলোকে তা মানাতে বাধ্য করেছে– এ প্রচারণা অনেকের মধ্যে একটি কল্পনাপ্রসূত, উদ্ভট ও অবাস্তব কাহিনী যা ইতিহাসবিদগণ বারবার বলে দিয়েছেন।'

বিশ্বে মুসলিম শাসন ছিল গৌরবের

মুসলমানদের আটশত বছরের স্পেন শাসন ছিল মানবতাবোধের এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন। সেখানে মুসলমানরা তরবারির সাহায্যে কোনো লোককে ধর্মান্তরিত করেনি। পরবর্তীকালে খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা স্পেনে আসে এবং সীমাহীন বর্বরতা চালিয়ে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। অতঃপর সেখানে এমন একজন মুসলমানও বেঁচে ছিল না, যে প্রকাশ্যে নামাযের জন্য আযান দিতে পারে।

◗ সমগ্র আরব ভূ-খণ্ডের ১৪০০ বছর মালিক ছিল মুসলমানরা। মাঝখানে কয়েক বছর ছিল ব্রিটিশ ফরাসি শাসন। মুসলমানরাই আরব ভূ-খণ্ড শাসন করেছে ১৪০০ বছর। অথচ আজো সেখানে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ আরবীয় খ্রিষ্টান বংশানুক্রমে বসবাস করছে। মুসলমানরা যদি তরবারি তথা শক্তি প্রয়োগ করতো তাহলে সেখানে একজন খ্রিষ্টানও থাকতে পারতো না।

◗ আনুমানিক এক হাজার বছর মুসলমানরা ভারত শাসন করেছে। তারা চাইলে ভারতের প্রত্যেকটি অমুসলিমকে শক্তি প্রয়োগ করে ধর্মান্তরিত করতে পারতো। অথচ আজো শতকরা ৮০ ভাগের অধিক অমুসলিম ভারতে বহাল তবিয়তে আছে। এ অমুসলিম ভারতীয়রা আজো সাক্ষী যে, মুসলমানরা তরবারির জোরে ইসলামকে প্রসারিত করেনি; বরং মুসলমানরা ন্যায় ও ভ্রাতৃত্ববোধের উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

◗ প্রাচ্যের ইন্দোনেশিয়া এমন একটি দেশ যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে অধিক মুসলমান বাস করে। মালয়েশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী মুসলমান। এখানে প্রশ্ন থেকে যায় কোন্ মুসলিম সেনাবাহিনী ইসলামের আধিপত্য বিস্তার করতে এ দু'টি দেশে গিয়েছিল? মুসলমানরা তলোয়ারের ক্ষমতা প্রয়োগ করেনি এটি তার অতিরিক্ত প্রমাণ।

◗ ইসলাম অত্যন্ত দ্রুত আফ্রিকার পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলে প্রসার লাভ করেছে। যে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, ইসলাম যদি তরবারির জোরে প্রসার লাভ করে থাকে, তাহলে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে কোন্ মুসলিম সেনাবাহিনী ইসলামের অধিপত্য বিস্তার করতে গিয়েছিল?

টমাস কার্লাইলের অভিমত

বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাসবিদ টমাস কার্লাইল তাঁর বিখ্যাত 'হিরোজ অ্যান্ড হিরো ওয়ার্শিপ' (Heroes and Hero worship) গ্রন্থে ইসলামের প্রসার বিষয়ে বিভ্রান্তি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন- 'তরবারি। কিন্তু কোথায় তুমি আমার তরবারি পাবে? সকল মতাদর্শই সূচনায় একজনের সংখ্যালঘু থাকে। মাত্র একজন মানুষের মাথায় তা থাকে। বিশ্বে মাত্র একজনই তা বিশ্বাস করে, একক একজন মানুষ সমগ্র মানুষের বিরুদ্ধে। সেই মানুষটি একটি তরবারি নেয় এবং তা দ্বারা তার মতাদর্শ প্রচার করার চেষ্টা চালায়। তাতে তার সামান্যতম কাজ হয়েছে কি? তোমার তরবারি তোমার নিজেকেই খুঁজে পেতে হবে। মোটকথা কোনো জিনিস যেভাবে সে পারে নিজে নিজেই প্রচারিত হবে।'

৫০ বছরে বিশ্বে ধর্মসমূহের প্রবৃদ্ধির হার

বিশ্ববিখ্যাত রিডার্স ডাইজেস্টের 'অ্যালম্যানাক' তথা বার্ষিক সংখ্যার একটি প্রবন্ধে বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মসমূহের অর্ধ শতাব্দীর (১৯৩৪-৮৪) একটি পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে। প্রবন্ধটি 'প্লেইন ট্রুথ' নামক ম্যাগাজিনেও প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত প্রবন্ধে প্রবৃদ্ধির তালিকার শীর্ষে রয়েছে ইসলাম। ইসলামের প্রবৃদ্ধির হার তাতে ২৩৫% (শতকরা দু'শত পঁয়ত্রিশ) উল্লিখিত হয়েছে। অথচ খ্রিষ্টধর্মের প্রবৃদ্ধির হার তাতে শতকরা ৪৭% ভাগ বলে উল্লেখিত হয়েছে। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, এ শতাব্দীতে কোন্ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল, যা কোটি কোটি মানুষকে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছে?

পাশ্চাত্যে ইসলামই দ্রুত বিকাশমান ধর্ম

বর্তমানে পাশ্চাত্যে তথা আমেরিকাতে যেমন সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান ধর্ম ইসলাম তেমনি ইউরোপেও সবচেয়ে দ্রুত বিকাশমান ধর্ম ইসলাম। স্বভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, পাশ্চাত্যের এ বিশাল সংখ্যক মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করছে কোন্ তরবারি?

banglainternet.com

পিয়ার্সনের অভিমত

ড. জোসেফ অ্যাডাম পিয়ার্সন যথার্থই বলেছেন, 'যেসব লোক আশঙ্কা করছে যে আণবিক বোমা কোনো একদিন আরবদের হাতে এসে পড়বে, তারা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে যে ইসলামী বোমা ইতোমধ্যে বর্ষিত হয়ে গেছে, এটা সেদিনই বর্ষিত হয়েছে যেদিন মুহাম্মদ (স) আরবের বুকে জন্মলাভ করেছেন।'

কুরআনে জবরদস্তির অনুমোদন নেই

যে তরবারির সাহায্যে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে বলে প্রচারণা চালানো হয়, সেই তরবারি যদি কোনো লোক পেয়েও থাকতো তবুও তা সে ব্যবহার করতো না। কেননা কুরআন মাজীদে সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতে নির্দেশ রয়েছে–

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۔

অর্থ ঃ দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই; নিঃসন্দেহে সত্য সঠিক পথ সুস্পষ্ট হয়ে গেছে ভুল পথ থেকে।

বস্তুত, ইসলাম যে তরবারি দিয়ে মানুষের হৃদয় জয় করেছে তা ছিল জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির তরবারি। কুরআন মাজীদের সূরা আন নাহলের ১২৫তম আয়াতে বলা হয়েছে–

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۔

অর্থ ঃ আপনি মানুষকে আপনার রবের পথের দিকে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা, বুদ্ধিবৃত্তি এবং উত্তম উপদেশ দানের মাধ্যমে। আর তাদের সাথে বির্তক করুন উত্তম পন্থায়।

মুসলমানরা সন্ত্রাসী নয়

প্রশ্ন : অধিকাংশ মুসলমান মৌলবাদী ও সন্ত্রাসী কেন?

উত্তর : সাধারণত ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত কোনো আন্তর্জাতিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুসলমানদের প্রতি এ প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেয়া হয়। প্রচারমাধ্যমগুলো অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ও বিরামহীনভাবে ভুল ও মিথ্যা প্রচার ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চালিয়ে যাচ্ছে। আসলে এ ধরনের ভুল তথ্য এবং মিথ্যা প্রচারণা দ্বারা মুসলমানদেরকে 'বর্বর ও সন্ত্রাসী' হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চলছে এবং অন্য ধর্মানুসারীদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে। আমেরিকার ওকলাহোমায় বোমা বিস্ফোরণের পর আমেরিকার প্রচার মাধ্যমগুলো এ ধরনের মুসলিম বিরোধী প্রচারণা চালিয়েছিল। অত্যন্ত দ্রুত তাদের প্রচার মাধ্যমগুলোতে ঘোষণা করা হয়েছিল, 'এ আক্রমণের নেপথ্যে মধ্যপ্রাচ্যের ষড়যন্ত্র রয়েছে'। অবশেষে আমেরিকার আর্মড ফোর্সের একজন সৈনিক অপরাধী হিসেবে প্রমাণিত হওয়ায় প্রচার মাধ্যমের ষড়যন্ত্রমূলক প্রচারণা বুমেরাং হয়ে যায়।

মৌলবাদ ও মৌলবাদী

কোনো বিষয়ে মূলনীতিই হচ্ছে 'মৌলবাদ'। যিনি তার চিন্তা ও বিশ্বাসে মূলনীতির অনুসরণ ও আনুগত্য করেন তিনিই 'মৌলবাদী'। একজন লোক যদি ডাক্তার হতে চায়, তাকে অবশ্যই ওষুধ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় ও মৌলিক কার্যকারিতা সম্পর্কে জেনে চিকিৎসাক্ষেত্রে তা অনুসরণ করতে হবে। অন্য কথায়, ওষুধের ক্ষেত্রে তাকে 'মৌলবাদী' হতে হবে। একইভাবে যিনি গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী হতে চান তাকে অবশ্যই গণিতশাস্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং সে অনুযায়ী অনুশীলন করতে হবে। অতএব বলা যায় যে তাকে অবশ্যই গণিতশাস্ত্রের ক্ষেত্রে 'মৌলবাদী' হতে হবে। যিনি ভালো বিজ্ঞানী হতে চান তাকে অবশ্যই বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলো জানতে, বুঝতে ও সে অনুযায়ী অনুশীলন করতে হবে, অর্থাৎ তাকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'মৌলবাদী' হতে হবে।

সকল মৌলবাদী এক নয়

সকল মৌলবাদীকে একইভাবে মূল্যায়ন করা যাবে না। মৌলবাদীর শ্রেণীবিন্যাস নির্ভর করে কোনো ব্যক্তি যে বিষয়ের ভিত্তিতে 'মৌলবাদী' বলে চিহ্নিত হয়েছে সে বিষয় ও তার কার্যাবলির ওপর। একজন 'মৌলবাদী ডাকাত' বা একজন 'মৌলবাদী চোর' সমাজের জন্য ক্ষতিকর। তাই এ জাতীয় মৌলবাদী সমাজে অনাকাঙ্ক্ষিত ও ক্ষতিকর। অপরদিকে একজন মৌলবাদী ডাক্তার সমাজের জন্য উপকারী। তাই মৌলবাদী ডাক্তার সমাজে কাঙ্ক্ষিত এবং সম্মানিত।

'মৌলবাদী মুসলিম' হতে পেরে আমি গর্বিত

আল্লাহর রহমতে আমি ইসলামের মূলনীতিসমূহ জানি, বুঝি এবং অনুসরণ করতে সাধ্যমত চেষ্টা করি। একজন সত্যিকার মুমিন কখনোই মৌলবাদী মুসলিম হতে লজ্জাবোধ করে না। আমিও একজন 'মৌলবাদী মুসলিম' হতে পেরে গর্বিত। কারণ ইসলামের মূলনীতিগুলো বিশ্ব মানবতার জন্য কল্যাণকর ও প্রয়োজনীয়।

banglainternet.com

ইসলামের এমন একটি মূলনীতিও নেই যা মানবজাতির জন্য ক্ষতিকর। অনেকে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে এবং ইসলামের কতিপয় শিক্ষাকে তারা অলৌকিক ও অবিচারমূলক মনে করে। এটা হয়েছে ইসলাম সম্পর্কে তাদের অপর্যাপ্ত ও ভ্রান্তিমূলক জ্ঞানের কারণে। একজন মানুষ যদি মুক্তমনে ও গভীরভাবে ইসলামের শিক্ষাগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, ইসলাম ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয় পর্যায়েই মানবতার জন্য একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন-বিধান।

আভিধানিক অর্থে 'মৌলবাদ'

ওয়েবষ্টার ডিকশনারি অনুযায়ী বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমেরিকার প্রোটেষ্ট্যান্ট মতবাদী খ্রিষ্টানদের একটি আন্দোলনের নাম (Fundamentalism) বা 'মৌলবাদ'। এটা ছিল আধুনিকতাবাদের বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া, বাইবেলের অকাট্যতার ওপর জোর প্রচেষ্টা। তা শুধু বিশ্বাস ও শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপারে নয় বরং সাহিত্য ও ঐতিহাসিক তথ্যাদি সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ আন্দোলন বাইবেলকে আক্ষরিক অর্থে ঈশ্বর-এর বাণী বলে বিশ্বাস করার ওপর জোর দেয়। যা হোক 'মৌলবাদী' এমন একটি শব্দ যা সূচনায় খ্রিষ্টানদের একটি দলের বিশ্বাস ও কর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। যারা বিশ্বাস করতো যে, বাইবেল আক্ষরিক অর্থেই 'গড'-এর বাণী যাতে কোনো ভুল নেই। অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুসারে Fundamentalism অর্থ যে কোনো ধর্ম বিশেষ করে ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান ও নীতিমালা কঠোরভাবে মেনে চলা। তবে বর্তমানে (অপপ্রচার ও তথ্য সন্ত্রাসের ফলে) Fundamentalism তথা 'মৌলবাদ' শব্দটি উচ্চারণ করতেই একজন ব্যক্তির মনে ভেসে ওঠে একজন মুসলিমের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কথা।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হওয়া উচিত

প্রত্যেক মুসলিমকে একেকজন সন্ত্রাসী হওয়া উচিত। একজন সন্ত্রাসী সেই ব্যক্তি যিনি সন্ত্রাসের মূল নায়ক। ডাকাত যখনই পুলিশকে দেখে, সে ত্রাসে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে পুলিশ ডাকাতের জন্য সন্ত্রাসী। অনুরূপ একজন মুসলমানকে সমাজ বিরোধী শক্তি যেমন চোর, ডাকাত ও ধর্ষকের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হওয়া কর্তব্য। যখনই উল্লিখিত সমাজবিরোধী শক্তি একজন মুসলমানকে দেখবে সে ত্রাসে আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। এটা সত্য যে, 'সন্ত্রাসী' শব্দটি এমন লোকের জন্য ব্যবহৃত হয়, যে সাধারণ জনগণের জন্য ত্রাস বা আতঙ্কের কারণ হয়। কিন্তু

একজন সত্যিকার মুসলিম শুধু কিছু লোকের জন্য যেমন– সমাজ বিরোধী শক্তি যারা জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয় তাদের জন্য সন্ত্রাসী। সমাজের সাধারণ মানুষের জন্য একজন মুসলিম সন্ত্রাসী নয় বরং পরম বন্ধু। সত্যিকার অর্থে সর্বসাধারণ তথা নিরীহ জনসাধারণের জন্য একজন মুসলিম হবে শান্তি ও কল্যাণের প্রতীক।

একই ব্যক্তি কখনও সন্ত্রাসী কখনও দেশপ্রেমিক

একই ব্যক্তিকে একই কাজের জন্য বিভিন্ন বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। কাউকে সন্ত্রাসী আবার কাউকে দেশ প্রেমিক। ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে অনেক স্বাধীনতা যোদ্ধাকে ব্রিটিশ সরকার 'সন্ত্রাসী' লেবেল লাগিয়ে দিয়েছিল। একই ব্যক্তিদের একই কাজের জন্য ভারতবাসী 'দেশপ্রেমিক' আখ্যা দিয়ে তাদের অভিনন্দিত করে। এভাবে একই ব্যক্তিদের একই কার্যাবলির জন্য ভিন্ন ভিন্ন লেবেল এঁটে দেয়া হয়। একপক্ষ তাদের 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দেয় অথচ অপরপক্ষ তাদের 'দেশপ্রেমিক' নামে আখ্যায়িত করে। যারা বিশ্বাস করতো ব্রিটেনের ভারত শাসনের অধিকার আছে, তারা বিপ্লবীদেরকে 'সন্ত্রাসী' আখ্যা দেয়। অপরদিকে যারা মনে করতো বৃটেনের ভারত শাসনের কোনো অধিকার নেই, তারা বিপ্লবীদের আখ্যা দেয় 'দেশপ্রেমিক' ও 'স্বাধীনতা যোদ্ধা হিসেবে'।

কাজেই কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে ভালো-মন্দ মন্তব্য করার আগে তার বক্তব্য আগে শুনতে হবে। পক্ষে-বিপক্ষে সব যুক্তিই শুনে নিতে হবে। অবস্থা বিশ্লেষণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ও তার কার্যাবলির কারণ সামনে রেখে সে অনুসারে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম শান্তির ধর্ম, যার মৌলনীতিসমূহ তার অনুসারীদের সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার শিক্ষা দেয় এবং শান্তি বজায় রাখার জন্য সচেষ্ট থাকতে বলে। অতএব প্রত্যেকটি মুসলমানকে মৌলবাদী হতে হবে অর্থাৎ শান্তির ধর্ম ইসলামের মৌলনীতিসমূহ তাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। সমাজ বিরোধী অপশক্তিগুলোর জন্যই সে হবে একজন 'সন্ত্রাসী' তথা আতঙ্ক সৃষ্টিকারী, তাহলেই সমাজে শান্তি ও ন্যায়-ইনসাফ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাবে এবং এ বৃদ্ধির ধারাও বজায় থাকবে।

banglainternet.com

মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার পার্থক্য

প্রশ্ন : সকল মুসলমান যখন একই আল্লাহর কিতাব 'আল-কুরআন মেনে চলে, তাহলে তাদের মধ্যে এত উপদল কেন? তাদের চিন্তা-চেতনায় এতো পার্থক্য কেন?

উত্তর : এটা অবশ্যই সত্য যে আজকের মুসলমানরা নানা দলে-উপদলে বিভক্ত। অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এ বিভক্তি ইসলামে মোটেই অনুমোদিত নয়। ইসলাম তার অনুসারীদের দৃঢ় ঐক্যে বিশ্বাসী। পবিত্র কুরআনের সূরা আলে-ইমরানের ১০৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে –

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۔

অর্থ ঃ তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না।

আল-কুরআনই হলো আল্লাহর সেই রজ্জু বা রশি যাকে ঐক্যবদ্ধভাবে সকল মুসলমানের আঁকড়ে ধরা উচিত। আয়াতে দ্বিগুণ জোর দেয়া হয়েছে, বলা হয়েছে– 'ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধরো।' আবার বলা হয়েছে 'পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না'। আল-কুরআনে আরো বলা হয়েছে–

اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ۔

অর্থ ঃ তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসূলের।

(সূরা নিসা ঃ ৫৯)

অতএব মুসলমানদের আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসসমূহের অনুসরণ করা উচিত এবং পরস্পর মতপার্থক্য করা উচিত নয়।

ইসলামে বিভক্তি নিষিদ্ধ

পবিত্র কুরআনে সূরা আল-আনআম এর ১৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ۔

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে এবং নিজেরা বিভক্ত হয়েছে বিভিন্ন দলে, তাদের কোনো কাজের দায়িত্ব তোমার নেই, তাদের বিষয় আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ তাদের অবহিত করবেন তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে।

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, যারা নিজেদের দ্বীনকে ভাগ করে নিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, তাদের থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখা উচিত। কিন্তু যখন একজন মুসলিমকে প্রশ্ন করা হয়, আপনি কে? তখন আমাদের একটি সাধারণ উত্তর হলো, 'আমি একজন সুন্নী' অথবা 'আমি একজন শিয়া' অনেকে নিজেদের 'হানাফী' অথবা 'শাফেয়ী' অথবা 'মালেকী' অথবা 'হাম্বলী' বলে পরিচয় দেয়। আবার অনেকে বলে, 'আমি একজন দেওবন্দি' আর কেউ কেউ বলে 'আমি একজন বেরেলভী'।

নবী (স) ছিলেন একজন মুসলিম

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, 'আমাদের প্রিয়নবী (স) কী ছিলেন? তিনি কি 'হানাফী' ছিলেন নাকি 'শাফেয়ী' নাকি 'মালেকী নাকি 'হাম্বলী'। এর উত্তর হলো– 'না, তিনি পূর্বে আগত নবী-রাসূলদের মতোই একজন মুসলিম ছিলেন। আল কুরআনের সূরা আলে ইমরানের ৫২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْ اِلَى اللّٰهِ ۔ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ ۔ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ ۔ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ۔

অর্থ ঃ যখন ঈসা (আঃ) বনী ইসরাঈল থেকে কুফুরী উপলব্ধি করলেন তখন তিনি বললেন আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে? সঙ্গী-সাথীরা বললো আমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্যকারী হবো। আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, আপনি সাক্ষী থাকুন নিশ্চয়ই আমরা মুসলিম (হুকুম মেনে নিলাম)। উক্ত সূরার ৬৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ۔

অর্থ ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) ইহুদি বা খ্রিস্টান কোনোটাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মুসলিম।

কেউ যদি কোনো মুসলমানকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কে?' তখন উত্তরে তার বলা উচিত 'আমি একজন মুসলিম–

হানাফী নই, শাফেয়ী নই'।

'মুসলিম' পরিচয় দেয়া কুআনের নির্দেশ

নবী করিম (স) অমুসলিম রাজা-বাদশাহদের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে চিঠি লিখিয়ে ছিলেন। সেসব চিঠিতে তিনি সূরা আস-সাজদার নিম্নোক্ত আয়াত উল্লেখ করেছিলেন–

banglainternet.com

وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

অর্থ ঃ আর তার কথা অপেক্ষা অধিক উত্তম কার কথা যে মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহবান করে এবং নিজেও সৎ কাজ করে আর বলে, আমি তো একজন আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)। (সূরা হা-মীম-আস-সাজদা : ৩৩)

ইসলামের মহান ব্যক্তিদের সম্মান দেখাতে হবে

অবশ্যই আমাদেরকে ইসলামের সুবিজ্ঞ মহান আলিমদের প্রতি সম্মান জানাতে হবে, যাদের মধ্যে রয়েছেন চার ইমাম : যথা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম মালিক (র.)। আল্লাহ তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করুন। তাঁরা ছিলেন ইসলামের জ্ঞানে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ তাঁদের জ্ঞান-গবেষণার জন্য উত্তম পুরস্কার দান করুন। সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে কেউ ইমাম চতুষ্টয়ের মধ্যে কারো অনুসরণ করলে কোনো ক্ষতি নেই; কিন্তু 'তুমি কে' এ প্রশ্নের উত্তরে তাকে বলতে হবে, আমি একজন মুসলিম।

কেউ কেউ সুনানে আবু দাউদের ৪৫৭৯ নং হাদীসটির উদ্ধৃতি দিয়ে যুক্তি দেখাতে পারেন যে, এ বিভক্তির কথা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) বলে গেছেন। উক্ত হাদিসে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, 'আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে।'

হাদিসটির মর্ম হলো, রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর উম্মতের পরিণতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তাঁর উম্মতের অবস্থা এমন হবে যে, তারা মতপার্থক্যে জড়িয়ে পড়বে, এমনকি তারা ৭৩টি দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। তিনি একথা বলেননি যে, তাঁতে উম্মতকে ৭৩টি দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করতে হবে। কুরআন মাজীদ আমাদের দল-উপদল সৃষ্টি করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। যারা কুরআন ও সহীহ হাদিসের নির্দেশ মেনে চলে এবং দল-উপদল সৃষ্টি করে না, তারাই সঠিক সত্য পথে আছে।

তিরমিযীর ১৭১ নং হাদীস অনুসারে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'আমার উম্মতগণ ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে, এবং একটি দল ছাড়া বাকি সব দলই জাহান্নামে যাবে।' সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! সেই একটি দল কোনটি হবে?' তিনি উত্তরে বললেন, 'সেই দলটি হবে যার মধ্যে আমি এবং আমার সাহাবায়ে কিরাম থাকবো।'

কুরআন মাজিদের বেশ কিছু আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং আনুগত্য করো তাঁর রাসূলের'। একজন খাঁটি মুসলমানের

উচিত হলো আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন এবং রাসূলের সহীহ হাদিসসমূহের নির্দেশ মেনে চলা। সে যে কোনো ইসলাম বিশেষজ্ঞের মত অনুসরণ করতে পারে, যদি সে বিশেষজ্ঞ আল কুরআন ও সহীহ হাদিসের অনুসারী হয়ে থাকেন। কিন্তু যদি তাঁর মত আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সহীহ হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে তার মতের কোনো মূল্যই নেই– এতে তিনি যত বড় বিশেষজ্ঞই হোন না কেন।

যদি সকল মুসলমান কুরআনকে বুঝে পড়ে এবং সেই মূলনীতি অনুসারে রাসূলের হাদিসকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়নের চেষ্টা চালায়, তবে ইনশাআল্লাহ সকল মতপার্থক্য দূর হয়ে যাবে এবং আমরা সকলেই একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম উম্মাহ হিসেবে গড়ে ওঠতে পারবো।

ইসলাম ও মুসলিমদের অনুশীলনগত পার্থক্য

প্রশ্ন : ইসলাম যদি সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হয়, তাহলে মুসলমানদের মধ্যে এত অসৎ, অবিশ্বস্ত, অনির্ভরযোগ্য লোক কেন? আর কেনইবা তারা প্রতারণা, ভ্রান্ত আসক্তি ইত্যাদি অসামাজিক কাজের সাথে জড়িত?

উত্তর : ইসলাম নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম; তবে প্রচার মাধ্যমগুলো পাশ্চাত্যবাসীদের নিয়ন্ত্রণে। যারা ইসলামকে ভয় পায়। এসব প্রচারমাধ্যম অনবরত ইসলামের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভুল তথ্যাবলি প্রচার করে যাচ্ছে। ছেপে চলছে মিথ্যা তত্ত্ব ও তথ্যাবলি। অথবা তারা আংশিক সত্যকে পুরোপুরি সত্যে পরিণত করে নির্দ্বিধায় প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে।

মুসলমানরা অপপ্রচারের শিকার

আমি ভালো করেই জানি যে, কতেক মুসলমান অসৎ, অনির্ভরযোগ্য যারা প্রতারণা ইত্যাদি অপকর্মের সাথে জড়িত। কিন্তু প্রচার মাধ্যমগুলো এটাকে এমনভাবে চিহ্নিত করে যেন শুধু মুসলমানরাই এসব অপকর্মের সাথে জড়িত। প্রত্যেক সমাজেই অসৎ লোক আছে এবং থাকবে। আমি জানি, মুসলিম সমাজেও মদ্যপায়ী লোক আছে ও থাকবে। কিন্তু যারা মদ্যপায়ী এবং তৎসঙ্গে অন্য অনেক অপকর্মের সাথে জড়িত, তাদের অধিকাংশই অমুসলিম।

পৃথিবীর কোথাও কোনো বোমা বিস্ফোরিত হলে, কোনো প্রমাণ ছাড়াই পশ্চিমারা সর্বপ্রথম সেটাকে মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে প্রচারণা শুরু করে দেয়।

banglainternet.com

পত্র-পত্রিকায় এটাকেই ব্যানার হেডিং করে ছেড়ে দেয়। পরবর্তীতে যদি প্রমাণিত হয় যে এ বিস্ফোরণের জন্য কোনো অমুসলিম দায়ী, তখন এটাকে গুরুত্বহীনভাবে পরিত্যাগ করে।

৫০ বছর বয়স্ক কোনো মুসলমান যদি ১৫ বছর বয়সের কোনো মেয়ের সম্মতিতেই বিয়ে করে, তখন এটা পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপার মতো একটি বড় খবর হয়ে দাঁড়ায়। আর ৫০ বছর বয়স্ক কোনো অমুসলিম যদি ৬ বছরের কোনো বালিকাকে ধর্ষণ করে, তখন এটা পত্রিকার ভেতরের পাতায় সংক্ষিপ্ত কলামে ছোট খবর হিসেবে ছাপা হয়। আমেরিকাতে গড়ে প্রতিদিন ২,৭১৩টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে; কিন্তু এসব ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না। যেহেতু এসব ঘটনাইতো আমেরিকানদের দৈনন্দিন জীবনের একটা অংশ।

সঠিক বিচারে মুসলমানরাই শ্রেষ্ঠ

মুসলিম সমাজে কিছু কিছু অসৎ লোকের অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা এবং মুসলিম সমাজ পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ। সামগ্রিকভাবে আমরাই মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত সর্ববৃহৎ সমাজ। আমরাই সামাজিকভাবে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি দান-দক্ষিণা করে থাকি। নৈতিকতা, সংযম, সহনশীলতা, পারস্পরিক সহানভূতি ও মানবিক মূল্যবোধের প্রশ্নে এখনও মুসলমানরাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

চালক দিয়ে গাড়ির বিচার ঠিক নয়

আপনি যদি কোনো গাড়ি সম্পর্কে সেটি কতটুকু ভালো বা মন্দ তা জানতে চান, তাহলে ড্রাইভিং সিটে এমন একজন এক্সপার্ট ড্রাইভারকে বসাতে হবে যে গাড়ি সম্পর্কে যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্যের খবর রাখে। একইভাবে ইসলামকে জানতে হবে তার সঠিক বাস্তবায়নকারী ও যথার্থ অনুসারী আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ (সা.) থেকে। বিশ্বের মুসলিম মনীষীগণ ছাড়াও অমুসলিম নিরপেক্ষ ইতিহাসবিদ রয়েছেন, যারা পক্ষপাতহীনভাবে দাবি করেছেন যে, মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম মানুষ। বিখ্যাত ঐতিহাসিক মাইকেল এইচ. হার্ট যিনি 'The Hundred most Influential men in History' (মানব ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী একশত ব্যক্তি) নামক বইয়ের রচয়িতা। তিনি মুহাম্মদ (সা.)-কে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি আমাদের প্রিয় নবীকে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়ে তালিকার প্রথম স্থান দিয়েছেন। তাছাড়া টমাস কার্লাইল ও লা-মার্টিন এবং আরো অনেক অমুসলিম ঐতিহাসিক নিরপেক্ষ বিচারে মুহাম্মদ (সা.) কে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছেন।

সকল অমুসলিম 'কাফির' নয়

প্রশ্ন : মুসলমানরা অমুসলিমদেরকে 'কাফির' বলে আখ্যায়িত করে কেন?

উত্তর : 'কাফির' অর্থ অস্বীকারকারী

'কাফির' শব্দটি আরবি اَلْكُفْر (আল-কুফরু) শব্দ থেকে উদ্ভূত। শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'গোপন করা' 'অস্বীকার করা' বা 'প্রত্যাখ্যান করা'। ইসলামের পরিভাষায় 'কাফির' এমন ব্যক্তিকে বলা হয়, যে সত্যকে গোপন করে বা প্রত্যাখ্যান করে। ইংরেজিতে যাকে আমরা Non Muslim বলে থাকি।

মনোকষ্ট হলে অমুসলিমদের উচিত ইসলাম কবুল করা

কোনো 'অমুসলিম' যদি 'কাফির' তথা 'নন-মুসলিম' শব্দটিকে 'গালি' মনে করে তবে তার উচিত ইসলাম গ্রহণ করে 'মুসলিম' জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া। আর তখনই কেবল আমরা তাকে 'কাফির' আখ্যায়িত করা থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হবো। নচেৎ যতদিন সে ইসলামের বাইরে থাকবে, ততদিন তাকে 'কাফির' তথা 'অমুসলিম' বলা ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে!

প্রসঙ্গ : শেষ নবী

প্রশ্ন : খ্রিষ্টান ও মুসলিমরা বিশ্বাস করে যীশু আবার পৃথিবীতে আসবেন। তা হলে কীভাবে মুহাম্মদ শেষ নবী হলেন?

উত্তর : যীশু খ্রিষ্ট আবার পৃথিবীতে আসবেন আমিও এ বিষয়ে একমত। এ সম্পর্কে কমপক্ষে ৭০টি হাদীস আছে। প্রতিটি হাদীসেই যিশুর প্রত্যাবর্তনের উল্লেখ আছে। বাইবেলেও বলা হয়েছে, যীশু দ্বিতীয় বার পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।

পবিত্র কুরআনের সূরা আহযাবের ৪০ নং আয়াতে বলা হয়েছে– "মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তির পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।"

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একই সাথে দুটি বক্তব্যই কীভাবে সঠিক হতে পারে। যীশু খ্রিষ্ট পুনরায় পৃথিবীতে আসলে মুহাম্মদ (স) কীভাবে সর্বশেষ নবী হন। তা হলে এটাও প্রশ্ন হতে পারে যে, যিশু খ্রিষ্ট কী জন্য পৃথিবীতে আসবেন?

আমরা জানি, যীশু খ্রিষ্ট হচ্ছেন সেই নবী যাকে আল্লাহ পৃথিবী থেকে জীবিত অবস্থায় তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তার অন্য কোনো রাসূলকেই জীবিত

banglainternet.com

অবস্থায় তুলে নেননি। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ১৫৮ নং আয়াতে উল্লেখ আছে, "বরং তাকে (যীশু খ্রিস্টকে) আল্লাহ তাআলা উঠিয়ে নিয়েছেন নিজের কাছে"। উক্ত সূরার ১৫৭ নং আয়াতে এ সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে, 'তারা তাকে হত্যাও করেনি ক্রুশবিদ্ধও করেনি'। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিলো। তারা এ বিষয়ে মতভেদ করেছিলো। তাদের মনেও ছিলো সংশয়। তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, যীশু খ্রিস্ট মারা যাননি। বাইবেলও যীশু খ্রিস্ট জীবিত ছিলেন এ কথা স্বীকার করেছে। হাদীসেও একই কথা বলা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তাআলা যীশু খ্রিস্টকে নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। কারণ, তিনিই মহান স্রষ্টার একমাত্র দূত, যার অনুসারীরা ভাবে তিনিই ঈশ্বর। তবে হযরত মূসা, নূহ, ইবরাহিম, ইসহাক, সোলাইমান, আদম এ সকল নবীদের কোনো অনুসারীই বলেননি যে তাদের নবীরা নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন, স্রষ্টা হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। শুধুমাত্র ঈসা (আ)-এর অনুসারীরাই তাকে ঈশ্বর দাবি করেন। পবিত্র কুরআনের সূরা মায়িদার ১১৬ ও ১১৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যীশু লোকদেরকে তাঁকে উপাসনা করার কথা বলেননি; বরং আল্লাহর উপাসনা করার কথাই বলেছেন এবং এ কথা বলেছেন আল্লাহকে সাক্ষী রেখে।

আর যীশু পৃথীতে আসবেন তার অনুসারীদেরকে বলতে, 'আমিতো নিজেকে ঈশ্বর বলিনি'। অর্থাৎ, যীশু তার অনুসারীদের মিথ্যা দাবির জবাব দিতে পৃথিবীতে আসবেন, রাসূল হিসেবে নয়। তিনি নতুন কোনো নির্দেশ নিয়ে পৃথিবীতে আসবেন না। কারণ, হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়ত প্রাপ্তির মাধ্যমেই নবুওয়তের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তা হলে যীশু পুনরায় হযরত মুহাম্মদ (স)-এর উম্মত হিসেবে পৃথিবীতে আসবেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা মায়িদার ৩ নং আয়াতে উল্লেখ আছে, "আজ আমি তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম। তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনিত করলাম"। এর পরে আর কোনো নির্দেশ আসবে না। তাহলে যীশু খ্রিস্ট মুহাম্মদ (স) এর উম্মত হিসেবে পৃথিবীতে আসবেন। তিনি পূর্বে মুসলিম ছিলেন পরেও মুসলিম থাকবেন।

সুতরাং, যিশু দ্বিতীয়বার পৃথিবীতে আসলেও তিনি নবী হিসেবে আসবেন না। তিনি হযরত মুহাম্মদ (স)-ই সর্বশেষ নবী।

প্রসঙ্গ : আখিরাত

প্রশ্ন : *আখিরাত তথা মৃত্যুর পরবর্তী কোনো জীবন আছে, তার প্রমাণ কী?*

উত্তর : কেউ কেউ ভেবে থাকেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে একজন সচেতন মানুষ 'মৃত্যুর পরে আর একটি জীবন আছে'– একথা কীভাবে বিশ্বাস করতে পারে? আখিরাতে অবিশ্বাসীরা মনে করে, যারা মৃত্যুর পরের জীবনে বিশ্বাস করে, তারা অবশ্যই অন্ধভাবে এ বিশ্বাস পোষণ করে। তবে আখিরাতে বিশ্বাস যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত– অন্ধবিশ্বাস নয়।

একটি যুক্তিনির্ভর বিশ্বাস আখিরাত

আল-কুরআনের এক হাজারের অধিক আয়াতে বর্ণিত বিষয়াদি বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রমাণিত। (এ বিষয়ে আমার রচিত 'কুরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান সামঞ্জস্যপূর্ণ অথবা অসামঞ্জস্যপূর্ণ' দ্রষ্টব্য) কুরআনে বর্ণিত অনেক সত্যই গত কয়েক শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত এতদূর অগ্রসর হতে পারেনি যে কুরআনে বর্ণিত সব বিষয়ই সত্য বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হবে।

যদি ধরে নেয়া হয়, কুরআনে বর্ণিত বিষয়সমূহের শতকরা ৮০ ভাগ সত্য বলে প্রমাণিত তাহলে বাকি ২০ ভাগ সম্পর্কে বিজ্ঞানের এখন পর্যন্ত কোনো মন্তব্য নেই। কারণ এখন পর্যন্ত বিজ্ঞান সে পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়নি যাতে যেসব বিষয়কে সত্য বা মিথ্যা বলে প্রমাণ করা যায়। অতএব সেই ২০ ভাগ-এর একটি আয়াত সম্পর্কেও আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে আমরা নিশ্চিত যে, আমরা তা মিথ্যা একথা বলতে পারি না। সুতরাং কুরআনের শতকরা ৮০ ভাগ যেখানে সত্য বলে প্রমাণিত এবং বাকি ২০ ভাগ এখনো অপ্রমাণিত, সেখানে যুক্তি বলে যে, সেই ২০ ভাগও সত্য হবে। আখিরাত তথা পরকালের অস্তিত্বও সেই ২০ ভাগের অন্তর্গত একটি সত্য, যা যুক্তির নিরিখে সত্য বলেই প্রমাণিত হবে।

পরকালের ধারণা এবং শাস্তি ও মানবিক মূল্যবোধ

ডাকাতি করা ভালো কাজ না মন্দ কাজ? এ প্রশ্নের জবাবে একজন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মানুষও বলবে যে, এটা মন্দ কাজ। যে ব্যক্তি আখিরাতে বিশ্বাস করে না সে ব্যক্তি একজন শক্তিমান ও প্রভাবশালী অপরাধীকে 'ডাকাতি মন্দ কাজ' একথা কীভাবে বোঝাতে সক্ষম হবে? ধরুন, আমি বিশ্বের মধ্যে একজন অত্যন্ত শক্তিশালী অপরাধী। একই সাথে আমি বুদ্ধিমান ও যুক্তিতে বিশ্বাসী একজন মানুষও

banglainternet.com

বটে। আমি বলি যে, ডাকাতি একটি ভালো কাজ। কারণ এটা আমাকে বিলাসী জীবন-যাপনে সাহায্য করে। সুতরাং ডাকাতি আমার জন্য ভালো কাজ। ডাকাতি একটি মন্দ কাজ, এর সপক্ষে কেউ যদি একটি যুক্তিও পেশ করতে পারে, তা হলে আমি ডাকাতি সাথে সাথে ছেড়ে দেব। সাধারণত যে সকল মানুষ যুক্তি পেশ করে থাকে, সেগুলো হলো–

যার সম্পদ ডাকাতি হয়েছে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ঃ কেউ হয়ত যুক্তি দেবে যে, যার মালামাল ডাকাতি হয়ে গেছে, সে খুবই অসুবিধায় পড়বে। এ ব্যাপারে আমিও তার সাথে একমত যে, সে লোকটি অসুবিধায় পড়বে; কিন্তু এটা আমার জন্য ভালো। আমি যদি ৫ হাজার ডলার অল্প সময়ের মধ্যে ডাকাতির মাধ্যমে অর্জন করতে পারি, তাহলে আমি একটি পাঁচতারা হোটেলে ভালো ভালো খাবার খেতে পারবো।

তুমি নিজেও ডাকাতির শিকার হতে পার ঃ কেউ হয়ত বলতে পারে যে, তুমিও অন্য কোনো ডাকাতের ডাকাতির শিকার হতে পারো। আমি বলবো, কেউ আমাকে তার ডাকাতির শিকার বানাতে পারবে না। কারণ আমি একজন অত্যন্ত শক্তিশালী অপরাধী। শত শত দেহরক্ষী আমাকে সার্বক্ষণিক ঘেরাও করে রাখে। আমি যে কোনো মানুষকে ডাকাতির শিকার বানাতে পারি। কিন্তু কোনো ডাকাত আমাকে ডাকাতির শিকার বানাতে পারবে না। ডাকাতি সাধারণ মানুষের জন্য একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশা হতে পারে; কিন্তু আমার মতো একজন ক্ষমতাবান ও প্রভাবশালী লোকের জন্য নয়।

পুলিশ তোমাকে শাস্তি দিতে পারে ঃ কেউ বলতে পারে তুমি যদি ডাকাতি কর, তাহলে পুলিশ তোমাকে গ্রেফতার করতে পারে। আমি বলবো যে, পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করবে না। কারণ আমি পুলিশকে নিয়মিত মাশোয়ারা দিয়ে থাকে। আমি বিশ্বাস করি যে, একজন সাধারণ মানুষ ডাকাতি করলে সে শীঘ্রই পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে যাবে। কিন্তু আমি একজন অসাধারণ শক্তিশালী অপরাধী। আমি আবারও বলছি মন্দ হওয়ার পেছনে একটি যুক্তি দিতে পারলেও এ কাজ ছেড়ে দেব।

সহজ পথে পাওয়া টাকা ঃ কেউ যুক্তি দেখাতে পারে যে, এটা সহজে পাওয়া টাকা। এটা শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত নয়। আমি বলবো যে, আমার ডাকাতি করার আসল কারণতো এটাই। সাধারণত টাকা উপার্জনের যদি দুটো পথ থাকে– একটি সহজ পথ, অপরটি কঠিন পথ। তবে বুদ্ধিমান হলে সে সহজ পথটিই বেছে নেবে।

মানবতাবিরোধী স্বার্থপর কাজ ঃ এ যুক্তিও কেউ প্রদর্শন করতে পারে যে, এটা মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য তৎপরতা। মানুষকে অপর মানুষের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। আমি পাল্টা যুক্তি খাড়া করাবো, 'মানবতার' এ বিধান কে রচনা করেছে? তার বিধান আমি মানবো কেন?

এ আইন তাদের জন্য ভালো হতে পারে, যারা আবেগপ্রবণ ও দুর্বলচিত্ত লোক। কিন্তু আমি একজন যৌক্তিক ও শক্তিশালী ব্যক্তি, অন্য মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর মধ্যে আমার নিজের কোনো কল্যাণ দেখি না।

কেউ আবার এটাকে একটা স্বার্থপর কাজ বলতে পারে। আমি বলবো– এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এটা একটা স্বার্থপর কাজ; কিন্তু আমি স্বার্থপর কেন হবো না? জীবনটাকে উপভোগে এটাইতো কাঙ্ক্ষিত পথ। ডাকাতির কাজটা মন্দ হওয়ার যৌক্তিক প্রমাণ নেই।

এখন ডাকাতির কাজটাকে মন্দ বলে প্রমাণ করার পক্ষে উপস্থাপিত সকল যুক্তি-প্রমাণ ব্যর্থ হয়ে গেল। এসব যুক্তি-প্রমাণ একজন সাধারণ মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারে; কিন্তু আমার মতো একজন যথেষ্ট শক্তিমান ও প্রভাবশালী অপরাধীকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। কোনো যুক্তিই কেবল কার্যকর ও বির্তকের বলিষ্ঠতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, পৃথিবী জুড়ে অনেক অপরাধী বিরাজমান।

একইভাবে আমার মতো লোকের জন্য নারী ধর্ষণ ও প্রতারণা প্রভৃতি কাজ খুব ভালো এবং এ কাজগুলো মন্দ হওয়ার পক্ষে এমন কোনো যৌক্তিক কারণ নেই, যেমনভাবে উক্ত কাজগুলোকে মন্দ বলে আমাকে বোঝাতে সক্ষম।

প্রভাবশালী একজন অপরাধীর দৃষ্টিভঙ্গি

এবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টাকে দেখা যাক। ধরুন আপনি বিশ্বখ্যাত একজন শক্তিশালী প্রভাবশালী অপরাধী। আপনি পুলিশ এমনকি মন্ত্রীকে পয়সা দিয়ে কিনে রেখেছেন। আপনার নিরাপত্তার জন্য রয়েছে একটা বিশাল অনুগত বাহিনী। আমি একজন মুসলিম। আমি আপনাকে বোঝাতে চাই যে, ডাকাতি, ধর্ষণ, প্রতারণা ইত্যাদি কাজগুলো অত্যন্ত মন্দ। এখন আমি যদি উপরিউক্ত যুক্তিগুলো আপনার সামনে পেশ করে আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করি আপনি আগের মতোই উত্তর দেবেন আমি আপনার সাথে একমত যে, আপনি যদি অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রভাবশালী অপরাধী হন, তবে আপনার যুক্তিগুলো যথার্থ।

banglainternet.com

প্রতিটি মানুষ চায় সুবিচার ঃ মানুষ যদি অন্যের জন্য সুবিচার না-ও চায় তবুও সে নিজের জন্য তা কামনা করে। কিছু লোক শক্তি ও প্রভাবের কারণে অবশ্যই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং অন্যদের দুঃখ কষ্টের কারণে পরিণত হয়। এ লোকেরাই আবার প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে, যখন তাদের প্রতি কোনো অবিচার করা হয়। কারণ এ ধরনের মানুষ অন্যের দুঃখ-কষ্টের প্রতি অনুভূতিহীন হয়ে থাকার কারণে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির পূজা করে। ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির সহায়তায় তারা অন্যের ওপর অবিচার করতে সুযোগ পাচ্ছে, শুধু তা-ই নয়, বরং অন্যরা যেন তাদের প্রতি একই অন্যায় আচরণ দেখাতে না পারে, তা-ও তারা প্রতিরোধ করছে।

আল্লাহ সবচেয়ে শক্তিমান সত্তা ও ন্যায়বিচারক ঃ মুসলিম হিসেবে আমি একজন অপরাধীকে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে একথা বলে বোঝাতে চেষ্টা করবো যে, আল্লাহ তোমার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান এবং তিনি ন্যায়বিচারকও বটে। কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে– إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

অর্থ ঃ আল্লাহ কখনো বিন্দুমাত্র অবিচার করেন না। (সূরা নিসা ঃ ৪০)

আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন না কেন ঃ অপরাধী, যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনা হওয়ার কারণে আল-কুরআনের বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত সত্যকে তার সামনে পেশ করার পর সে আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে একমত। এখন সে যুক্তি পেশ করতে পারে যে, আল্লাহ যদি শক্তিমান ও ন্যায়বিচারক হয়ে থাকবেন, তাহলে তিনি আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন না কেন?

অন্যায়-অবিচারকারীর শাস্তি হওয়া আবশ্যক

আর্থিক বা সামাজিকভাবে জুলুমের শিকার প্রতিটি ব্যক্তিই চায় যে, জালিমের শাস্তি হোক। প্রতিটি সাধারণ মানুষের আন্তরিক কামনা–ডাকাত, প্রতারক ও ধর্ষকের উচিত শিক্ষা হোক। অসংখ্য অপরাধী যদিও ধরা পড়ছে, তাদের মধ্যে কারো কারো শাস্তি হচ্ছে, কিন্তু আরো অনেক অপরাধী মুক্ত রয়েছে এবং তারা মানুষকে নির্যাতন করেই যাচ্ছে। যখন কোনো শক্তিশালী বা প্রভাবশালী কারোর ওপর তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী ও প্রতিপত্তিশালী কারও দ্বারা অত্যাচার-অবিচার হয়, তখন এ অপরাধী লোকটিও তার ওপর যুলুমকারী অপরাধীর শাস্তি দাবি করে।

পার্থিব জীবন পরকালের জন্য পরীক্ষা ঃ পরকালীন স্থায়ী জীবনে সফলতার সাথে প্রবেশের জন্য ইহকালীন জীবন একটি পরীক্ষা-স্বরূপ। এ সম্পর্কে কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে–

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ـ

অর্থ ঃ যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যেন তিনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন কর্মের দিক থেকে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম। তিনি তো অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (সূরা মুলক : ২)

চূড়ান্ত ফয়সালা শেষ বিচারের দিনে ঃ কুরআন মাজিদে সূরা আলে ইমরানের ১৮৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ـ

অর্থ ঃ নিশ্চয় প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। অবশ্যই কিয়ামতের দিন তোমাদের কর্মফল তোমরা পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হবে। তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে, সেই হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন তো ছলনাময় ক্ষণিকের ভোগ-সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়।

মানুষের কৃতকর্মের জন্য শেষ বিচার দিনেই হবে চূড়ান্ত ফয়সালা। কোনো ব্যক্তি যখন মরে যাবে তাকে পুনরায় শেষ বিচার দিনে পুনরুজ্জীবিত করা হবে সকল মানুষের সাথে। কোনো অপরাধী দুনিয়ার জীবনে তার অপকর্মের কিছু শাস্তি পেয়েও যেতে পারে। তবে চূড়ান্ত শাস্তি তাকে দেয়া হবে মৃত্যু পরবর্তী জীবনে তথা আখিরাতে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ কোনো ডাকাত বা ধর্ষককে এ দুনিয়াতে শাস্তি না-ও দিতে পারেন; কিন্তু শেষ বিচারের দিনে তাকে অবশ্যই আল্লাহর সামনে জবাবদিহী করতে হবে এবং তাকে সেখানে অবশ্যই বিচারের সম্মুখীন হতে হবে এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

মানবরচিত আইন হিটলারকে কী শাস্তি দেবে

হিটলার তার সন্ত্রাসের রাজত্ব বিস্তারের সময় ৬০ লক্ষ ইহুদিকে নির্মমভাবে পুড়িয়ে মেরেছে। পুলিশ যদি তখন তাকে আটক করতে সক্ষম হতো, তাহলে মানবরচিত আইন ন্যায়বিচার করে তাকে কি শাস্তি দিতে পারতো? বড়জোর তাকে গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু এতে হয়তো একজন ইহুদিকে হত্যার প্রতিবিধান হতো, কিন্তু বাকি ৫৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৯ শত ৯৯ জন ইহুদিকে হত্যার বিচার করা সম্ভব হতো কীভাবে?

হিটলারকে জাহান্নামে ৬০ লক্ষ বার শাস্তি দেয়া সম্ভব ঃ আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে সূরা নিসার ৫৬ নং আয়াতে ইরশাদ করেন–

banglainternet.com

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا ۖ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۔

অর্থ ঃ যারা আমার বিধানসমূহকে অস্বীকার করে আমি তাদের অচিরেই দোযখে প্রবিষ্ট করাব। যখনই তাদের চর্ম দগ্ধ হয়ে গলে পড়বে তখনই তার স্থলে আমি নতুন চর্ম সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তির স্বাদ ভোগ করতে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহ যদি চান তাহলে তিনি আখিরাতে হিটলারকে ৬০ লক্ষ বার জাহান্নামে পুড়ে মরার স্বাদ আস্বাদন করাতে পারেন।

আখিরাতে বিশ্বাস ছাড়া ভালো-মন্দের ধারণা অর্থহীন : এখন প্রমাণিত হলো যে, কোনো ব্যক্তিকে আখিরাত তথা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আস্থাশীল করা ছাড়া তার মানবিক মূল্যবোধ ও কৃফল সম্পর্কে বোঝাতে চেষ্টা করা অর্থহীন, বিশেষ করে সে যদি হয় একজন প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী অত্যাচারী ব্যক্তি।

প্রসঙ্গ : হিজাব

প্রশ্ন : পর্দা ব্যবস্থা বা হিজাব প্রবর্তনের মাধ্যমে ইসলাম নারীকে অবমূল্যায়ন করেছে কেন?

উত্তর : ইসলামে নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত বিষয়গুলো সেকুলার তথা ধর্মহীন প্রচার মাধ্যমগুলোর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল হয়ে থাকে। হিজাব বা ইসলামি পোশাককে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে নারী নিগ্রহের বড় প্রমাণ হিসেবে। নারীর জন্য 'হিজাব' তথা ইসলামি পোশাক প্রবর্তনের পেছনে ধর্মীয় কারণগুলো বিশ্লেষণের আগে ইসলামের আগমনের পূর্বে তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থা ও অবস্থান কীরূপ ছিল তা আমাদের জানা প্রয়োজন।

ইসলাম-পূর্বকালে নারী ছিল মূল্যহীন ভোগ্যপণ্য

বর্ণিত উদাহরণগুলোর মাধ্যমে আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে অতীতের সভ্যতাগুলোতে নারীর মর্যাদা কীরূপ ছিল। তৎকালীন ইসলাম-পূর্ব সমাজে নারীর মর্যাদা বলতে কিছুই ছিল না। এমনকি তাদের ন্যূনতম মানবিক মর্যাদা দিতেও সমাজ প্রস্তুত ছিল না।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ঃ ব্যাবিলনীয় আইনে নারী ছিল নিতান্ত মূল্যহীন ও অপাংক্তেয়। যাবতীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত নারীদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে ছিল যে, কোনো পুরুষ যদি কোনো নারীকে হত্যার অপরাধে অপরাধী হতো তা হলে সেই পুরুষের পরিবর্তে তার স্ত্রীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো।

গ্রিক সভ্যতা ঃ গ্রিক সভ্যতাকে প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতা হিসেবে ইতিহাসে স্থান দেয়া হয়েছে। কথিত এই গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতায় নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুন এবং সর্বপ্রকার অধিকার থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। তাদের অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখা হতো এবং তারা ছিল নিগৃহীত। গ্রিক পুরাণে উল্লেখিত 'প্যানডোরা' নামীয় কাল্পনিক নারীকে মানবজাতির সকল দুর্ভাগ্যের মূল বলে উল্লেখ করা হয়। গ্রিক জাতি নারীকে অপূর্ণাঙ্গ মানুষ তথা মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী বলে মনে করতো। নারীর সতীত্ব অত্যন্ত মূল্যবান ছিল। এক সময়ে নারীকে গ্রিকরা দেবীর আসনে বসিয়ে পূজা করতো। কিন্তু কিছুকাল পরেই গর্ব, আত্মঅহঙ্কার ও অবাধ যৌনাচার সংস্কৃতিতে তারা মেতে ওঠে। এমনকি গ্রিক সমাজের সর্বস্তরের মানুষ বেশ্যালয়ে যেতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে এবং এটা সর্বশ্রেণীর মানুষের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়।

রোমান সভ্যতা ঃ রোমান সভ্যতা যখন সর্বব্যাপী ও তার উন্নতির চরম শিখরে অবস্থান করছিল, তখন নারীর প্রতি আচরণ এমন ছিল যে, একজন পুরুষ যখন ইচ্ছা তার স্ত্রীকে হত্যা করতে পারতো। তাদের নৈতিকতা ও মনুষ্যত্ববোধ এমন স্তরে পৌঁছেছিল যে, নগ্নতা ও বেশ্যালয়ে যাতায়াত রোমানদেরও সাধারণ সংস্কৃতিতে পরিণত হয়ে উঠেছিল।

মিসরীয় সভ্যতা ঃ মিসরীয় সভ্যতায় নারীর কোনো অধিকার ছিল না। নারীকে অলক্ষুণে এক শয়তানের চিহ্ন বলে গণ্য করা হতো।

ইসলাম-পূর্ব আরব ঃ আরবে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখা হতো এবং নারী-শিশু জন্মগ্রহণ করলে তাকে জীবিত কবর দেয়া ছিল সাধারণ ব্যাপার।

ইসলাম নারীকে দিয়েছে উচ্চ মর্যাদা

ইসলাম নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং ১৪ শত বছর আগে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রদান করেছে।

পুরুষের জন্য পর্দা ঃ সাধারণত পর্দার আলোচনায় মানুষ নারীদের পর্দার কথাই বলে। কুরআন মাজীদে নারীদের পর্দার আগে পুরুষের পর্দার কথা তুলে ধরা হয়েছে। সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন-

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۔

banglainternet.com

অর্থ ঃ (হে নবী) আপনি মু'মিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেনো তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে। এটাই তাদের জন্য উত্তম। অবশ্যই তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।

নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টি পড়লে কোনো অসঙ্গত ও অশালীন চিন্তা পুরুষের মনে সৃষ্টি হতে পারে। এ জন্যই পুরুষের দৃষ্টিকে অবনত ও নিয়ন্ত্রিত রাখা উচিত।

নারীর জন্য পর্দা ঃ সূরা নূর-এর ৩১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ ....

অর্থ ঃ আর (হে নবী) আপনি ঈমানদার নারীদের বলে দিন তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাযত করে এবং তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, আর তারা যেন তাদের চাদর স্বীয় বক্ষের ওপর জড়িয়ে রাখে। আর তারা যেন নিজেদের সৌন্দর্য কারো কাছে প্রকাশ না করে, এদের ব্যতীরেকে–তাদের স্বামী, তাদের পিতা, তাদের শ্বশুর, তাদের পুত্র।

হিজাব বা পর্দার শর্ত

পর্দার সীমানা ঃ পর্দার প্রথম শর্ত হলো দেহের যে অংশ পর্যন্ত ঢাকানো যাবে তার সীমানা। কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী নারী ও পুরুষের এ সীমানায় পার্থক্য রয়েছে। পুরুষের জন্য বিধান হচ্ছে কমপক্ষে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে ঢেকে রাখতে হবে। আর নারীর জন্য এ সীমা হলো কব্জি পর্যন্ত হাত ও মুখমণ্ডল ছাড়া সমস্ত শরীর ঢেকে রাখতে হবে। তবে তারা চাইলে মুখমণ্ডলও ঢেকে রাখতে পারে। ইসলামী বিশেষজ্ঞদের কেউ কেউ হাত ও মুখমণ্ডলকেও বাধ্যতামূলক ঢেকে রাখার পক্ষপাতি। তারা এ দুটি অংশকেও 'হিজাব' বা পর্দার আওতাভুক্ত মনে করেন।

পোশাকের প্রকৃতি

- পরিধেয় পোশাক ঢিলেঢালা হতে হবে যেন শরীরের কাঠামো প্রকাশ না পায়।
- ঢেকে রাখা অংশ দেখা যায়–পোশাক এমন স্বচ্ছ ও পাতলা হবে না।
- এমন জাঁকজমকপূর্ণ আকর্ষণীয় পোশাক পরা যাবে না যাতে বিপরীত লিঙ্গ আকর্ষিত হয়।

- নারী পুরুষের মতো এবং পুরুষ নারীর মতো পোশাক পরতে পারবে না।
- অবিশ্বাসীদের পোশাকের মতো পোশাক হতে পারবে না। অর্থাৎ অন্য ধর্মালম্বীর পরিচয় বহন করে এমন পোশাক পরা যাবে না। অথবা এমন পোশাক পরা যাবে না যে পোশাক অন্য ধর্মের তথা অবিশ্বাসীদের জাতীয় প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত।

আচার-আচরণ হিজাব-এর অন্তর্ভুক্ত ঃ পোশাক সম্পর্কিত উল্লেখিত শর্তসমূহের পাশাপাশি ব্যক্তিকে নৈতিক চরিত্র, আচার-আচরণ, ভাব-ভঙ্গি ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের ওপরও পূর্ণাঙ্গ পর্দা মেনে চলতে হবে। একজন ব্যক্তি পোশাক সংক্রান্ত পর্দার শর্তগুলো পূরণ করলে সীমিত অর্থেই পর্দা পালন করলো। পোশাকের সাথে সাথে চোখের পর্দা, মনের পর্দা, চিন্তা-চেতনার পর্দা এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পর্দাও থাকতে হবে। একই সাথে ব্যক্তির চলাফেরা, কথা-বার্তা এবং আচার-আচরণ ইত্যাদির পর্দাও শামিল।

হিজাব উৎপীড়ন প্রতিরোধক

কুরআন মাজীদে সূরা আল-আহযাবের নিম্ন বর্ণিত আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে–

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ـ

অর্থ ঃ হে নবী ! আপনি আপনার পত্নীদেরকে, আপনার কন্যাদেরকে এবং মুমিনদের নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেমন ওড়না নিজেদের ওপর টেনে দেয়। এতে সহজেই তাদের পরিচয় পাওয়া যাবে। ফলে তারা নির্যাতিতা হবে না। আর আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

আল-কুরআন অনুযায়ী নারীদের জন্য 'হিজাব' বা পর্দার বিধান এজন্য দেয়া হয়েছে তারা যেনো সম্ভ্রান্ত মহিলা হিসেবে পরিচিত হয়। ফলে নির্যাতন থেকেও তারা রেহাই পাবে।

একটি দৃষ্টান্ত ঃ ধরা যাক একই পরিবারে দু'বোন যমজ। উভয়েই সমানভাবে সুন্দরী। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে উভয়ে। তাদের একজন ইসলামী হিজাবে আবৃতা; অর্থাৎ কব্জি পর্যন্ত হাত এবং মুখমণ্ডল ছাড়া তার সারা শরীর ঢাকা। অপরজন পশ্চিমা পোশাকে। একটি মিনি স্কার্ট অথবা শর্টস্ পরিহিতা। সামনে রাস্তার ওপারে কয়েকজন বদমাশ ছেলে কোনো মেয়েকে উত্যক্ত করার জন্য ওঁত পেতে বসে আছে। এখন বলুনতো তারা কাকে উত্যক্ত করবে? যে মেয়েটি ইসলামী 'হিজাব'

banglainternet.com

পরিহিতা তাকে, নাকি যে মেয়েটি পশ্চিমা পোশাক মিনি স্কার্ট বা শর্টস্ পরিহিতা তাকে? স্বাভাবিকভাবেই বখাটে ছেলেগুলো পশ্চিমা পোশাক পরিহিতা মেয়েটিকেই উত্যক্ত করবে। এ ধরনের পোশাক পরোক্ষভাবে নিজেকে উত্যক্ত করা এবং নির্যাতন করার আমন্ত্রণ হয়ে দাঁড়ায়। পবিত্র কুরআন যথার্থই বলেছে, 'হিজাব' নারীকে পুরুষের নির্যাতন থেকে রক্ষা করে।

শ্লীলতাহানির সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

প্রশ্ন : ইসলামে শ্লীলতাহানির শাস্তি কি বর্বরতা নয়?

উত্তর : ইসলামি শরীয়াহ আইনে কোনো পুরুষ শ্লীলতাহানির দায়ে অভিযুক্ত হলে তার সর্বোচ্চ শাস্তি প্রকাশ্য মৃত্যুদণ্ড। কেউ আবার বলেই ফেলেন যে, ইসলাম একটি নিষ্ঠুর এবং বর্বর ধর্ম। অথচ আমি যখন শত শত অমুসলিম পুরুষের কাছে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে জানতে চেয়েছি– ধরুন আল্লাহ না করুন কোনো বদমাশ আপনার স্ত্রী, আপনার মাতা বা বোনকে ধর্ষণ করেছে, আপনি বিচারকের আসনে উপবিষ্ট। অপরাধীকে আপনার সামনে আনা হয়েছে। আপনি তাকে কী শাস্তি দেবেন? তখন তারা এ প্রশ্নের উত্তরে ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন স্রেফ মৃত্যুদণ্ডই তার প্রাপ্য। তাদের কেউ কেউ বাড়িয়ে এতটুকু বলেছেন যে, তারা নির্যাতনের মাধ্যমে ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করবেন। তাদেরকে আমি প্রশ্ন করেছি, কেউ আপনার স্ত্রী বা মাতাকে ধর্ষণ করলে তাকে আপনি মৃত্যুদণ্ড দিতে চান অথচ একই অপরাধ যদি অন্যদের স্ত্রী বা কন্যার ওপর সংঘটিত হয়, তখন আপনি মৃত্যুদণ্ডের শাস্তিকে বলবেন বর্বরতা। তাই একই অপরাধের বিচারে দু'ধরনের রায় হতে পারে না।

নারী মর্যাদার পশ্চিমা দাবি মিথ্যা

নারীকে স্বাধীনতা দেয়ার ব্যাপারে পশ্চিমাদের দাবি মূলত নারীদেরকে পেষণ, তার আত্মার অবমাননা এবং তার সম্মান মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করার একটি প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। পশ্চিমা সমাজ দাবি করে যে তারা নারীকে উর্ধ্বে উঠিয়েছে। আর বাস্তবতা হলো তারা নারীকে তাদের সম্মানের আসন থেকে নামিয়ে উপপত্নী, রক্ষিতা ও মক্ষীরাণী বানিয়ে ছেড়েছে। তারা নারীদেরকে বিলাসী পুরুষদের ভোগের উপকরণ ও যৌন ব্যবসায়ীদের সস্তা পণ্যে পরিণত করেছে। আর শিল্প সংস্কৃতির রঙিন পর্দায় তারা তা আড়াল করেছে।

আমেরিকায় নারী ধর্ষণের হার সর্বোচ্চ

বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিবেচনা করা হয়। অথচ বিশ্বের মধ্যে নারী ধর্ষণের সর্বোচ্চ হারও ঐ দেশেই। ১৯৯০ সালের এফ.বি.আই.(F.B.I.) রিপোর্ট অনুযায়ী কেবল আমেরিকাতেই গড়ে দৈনিক ১,০৫৬টি ধর্ষণজনিত অপরাধ সংঘটিত হয়। পরবর্তী অন্য একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, আমেরিকায় গড়ে প্রতিদিন ১,৯০০ ধর্ষণের ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়। রিপোর্টটিতে কাল উল্লেখিত হয়নি। তবে তা ১৯৯২ বা ১৯৯৩ সাল হবে বলে ধারণা করা হয়। সম্ভবত উল্লিখিত বছরগুলোতে আমেরিকানরা আরো অধিক হিংস্র হয়ে উঠেছিল। আমরা যদি এখন একটা চিত্র অঙ্কন করি তাহলে দেখা যাবে– আমেরিকাতে 'ইসলামী হিজাব' অনুসৃত হচ্ছে, প্রত্যেকটি নারী 'ইসলামী হিজাব' তথা পর্দার বিধান অনুসরণ করছে। অর্থাৎ প্রত্যেক নারী মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত হাত ছাড়া সমস্ত শরীর ঢেকে রাস্তায় বের হচ্ছে, যখনই কোনো পুরুষ কোনো নারীর দিকে তাকাচ্ছে এবং তার মনে কোনো অসৎ-অশ্লীল চিন্তা আসতে পারে মনে করে তখনই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছে, এর পরেও কোনো অসৎ পুরুষ ধর্ষণের মতো অপরাধ সংঘটিত করলে ইসলামের দণ্ডবিধান অনুযায়ী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের বিধান তার ওপর কার্যকর করা হচ্ছে– এখন আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, এ দৃশ্যপটে যে চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে এমন একটা পরিবেশে আমেরিকায় ধর্ষণের ঘটনা কি বাড়বে, একই সমান থাকবে, নাকি কমবে?

ইসলামী শরীআহ বর্বর নয়

সত্যিকার অর্থেই যদি ইসলামী শরীআহ আইন কার্যকর হয় তবে তার ফলাফল অবশ্যই ইতিবাচক হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই; বরং অপরাধের হার আশাতীতভাবে কমে যাবে। বিশ্বের কোনো দেশে ইসলামের কল্যাণধর্মী শরীআহ আইন কার্যকর হলে, তা আমেরিকা বা ইউরোপের অন্য কোনো দেশে হোক, সেখানকার জনগণ মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। 'হিজাব' বা পর্দা নারীকে অবমূল্যায়ন করে না; বরং সতীত্ব এবং সম্ভ্রম সুরক্ষা করে নারীকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে। অতএব, ইসলামী শরীআহ আইন বর্বর নয়।

banglainternet.com

প্রসঙ্গ : বহুবিবাহ

প্রশ্ন : ইসলামে পুরুষকে বহুবিবাহের অনুমতি কেন দেয়া হয়েছে?

উত্তর : 'বহুবিবাহ' (Polygamy) অর্থ এমন এক বিবাহ পদ্ধতি যেখানে একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকে। বহুবিবাহ দু'প্রকার হতে পারে। একটি হলো, (Polygamy) যেখানে একজন পুরুষ একাধিক মহিলা বিবাহ করে। অপরটি হলো (Polyandry) যেখানে একজন মহিলা একাধিক পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ইসলাম সীমিত পর্যায়ে 'বহুবিবাহ' অনুমোদন দিয়েছে। তবে একজন নারীর জন্য একই সাথে একাধিক পুরুষকে বিবাহ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার কেন অনুমোদন দিয়েছে সে বিষয়ে আলোকপাত করা যাক।

একমাত্র কুরআন একক বিবাহের নির্দেশ করে

পবিত্র কুরআনই হলো একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যাতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে 'একটি মাত্র বিবাহ করো'। এছাড়া আর কোনো ধর্মগ্রন্থে এমন নেই যাতে একটি মাত্র বিবাহ করার নির্দেশ রয়েছে। এক স্ত্রী গ্রহণ সম্পর্কে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, বাইবেল, তালমুদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের কোনো একটি ধর্মগ্রন্থেও বহু বিবাহ বা স্ত্রীদের সংখ্যার ব্যাপারে কোনো প্রকার নির্দিষ্ট সীমা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়নি। এসব ধর্মগ্রন্থ অনুসারে একজন পুরুষ যত ইচ্ছে বিবাহ করতে পারে। হিন্দু পুরোহিত ও খ্রিষ্টান পাদ্রিগণ স্ত্রীদের সংখ্যা 'এক'-এ সীমিত করে দিয়েছেন অনেক পরে।

হিন্দুধর্মীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব তাদের ধর্মগ্রন্থের অনুমোদন অনুসারে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। রামের পিতা রাজা দশরথের একাধিক স্ত্রী ছিল। অনুরূপ ভগবান শ্রী কৃষ্ণেরও কয়েকজন স্ত্রী ছিল। পূর্বে খ্রিষ্টানদের জন্য যত ইচ্ছে স্ত্রী গ্রহণের অনুমোদন ছিল। কারণ বাইবেলে স্ত্রীদের সংখ্যার ব্যাপারে কোনো বিধি-নিষেধ ছিল না। মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে খ্রিষ্টান পাদ্রিগণ স্ত্রীদের সংখ্যা একজনে সীমিত করে দেন।

একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি ইহুদি ধর্মে আছে। তালমুদের আইন অনুসারে আব্রাহাম অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর তিনজন স্ত্রী ছিল এবং সলেমান অর্থাৎ হযরত সুলায়মান (আ)-এর শতাধিক স্ত্রী ছিল। ইহুদি রাব্বী জারসম বেন ইহুদাহ পর্যন্ত (৯৬০ খ্রি হতে ১০৩০ খ্রি.) বহুবিবাহের এ ধারা জারি ছিল। অতঃপর তিনি এর বিরুদ্ধে একটি আদেশ জারি করেন।

banglainternet.com

ইহুদি শেফারডিক সম্প্রদায় যারা মুসলিম দেশসমূহে বসবাস করে তারা বেশির ভাগ বহুবিবাহের এ প্রথাকে নিকট অতীতের ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু রাখে। পরে ইসরাঈলের প্রধান রাব্বী এক সংশোধনী বিধি জারির মাধ্যমে একের অধিক স্ত্রী রাখা নিষিদ্ধ করেন।

হিন্দুরা অধিক বহুপত্নীক

'কমিটি অব্ দ্য স্ট্যাটাস অব্ উমেন ইন ইসলাম'-এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের মধ্যে বহুবিবাহের হার উল্লেখিত হয়েছে অধিক। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনের ৬৬ থেকে ৬৭ পৃষ্ঠায় এ তথ্য প্রকাশ হয়। ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত বছরগুলোতে দেখা গেছে শতকরা ৫.০৬ ভাগ হিন্দু বহুপত্নীক। অন্যদিকে মুসলমানদের মধ্যে এ হার শতকরা ৪.৩১ ভাগ। ভারতীয় আইনের বিধান অনুসারে ভারতে কেবল মুসলমানদের বহুবিবাহ অনুমোদিত। ভারতে কোনো অমুসলিমের একাধিক স্ত্রী রাখা বেআইনি। বেআইনি হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুরা মুসলমানদের তুলনায় অধিক স্ত্রী গ্রহণ করে। আগে এ ব্যাপারে সেখানে কোনো বিধি-নিষেধই ছিল না। এমনকি হিন্দু-মুসলমান সকলের জন্যই একাধিক স্ত্রী রাখা অনুমোদিত ছিল। ১৯৫৪ সালে 'হিন্দু বিবাহ আইন' পাস করার পর হিন্দুদের জন্য একের অধিক স্ত্রী রাখা বেআইনি ঘোষণা করা হয়। বর্তমান ভারতীয় আইনে একজন হিন্দু পুরুষ কর্তৃক একাধিক স্ত্রী রাখা আইনসিদ্ধ নয়। কিন্তু এটা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের বিধান নয়।

আল কুরআনে বহুবিবাহ সীমিত

ইসলাম একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমোদন কেন দিয়েছে তা বিশ্লেষণ করা যাক।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভূপৃষ্ঠে আল-কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যা নির্দেশ করে, 'কেবল একটি বিবাহ করো।' এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের সূরা আন-নিসায় উল্লেখ করা হয়েছে।

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً .

অর্থ : তবে বিয়ে করে নাও নারীদের মধ্য থেকে যাকে তোমাদের পছন্দ হয় দুই, তিন কিংবা চারজন পর্যন্ত, কিন্তু যদি আশঙ্কা করো যে, তাদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে (বিয়ে করো)।

কুরআন নাযিলের পূর্বে বহুবিবাহের সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ধারিত ছিল না। বহু লোক স্ত্রীর সংখ্যার ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতো। কেউ কেউতো শতাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতো। ইসলামই চারজন স্ত্রী রাখার সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়। ইসলাম একজন পুরুষকে দুই, তিন অথবা চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয় এ শর্তে যে, সে (স্বামী) তাদের মধ্যে সুবিচার করতে সমর্থ হবে।

এছাড়া সূরা নিসায় বলা হয়েছে- وَلَنْ تَسْتَطِيعُوٓا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَآءِ

অর্থ ঃ তোমরা কখনও স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে পারবে না।

(সূরা নিসা ঃ ১২৯)

কাজেই বহু বিবাহ কোনো বিধিবদ্ধ বিধান নয় বরং একটি বিশেষ বা বিকল্প ব্যবস্থা মাত্র। অনেকের এ ভুল ধারণা রয়েছে যে, একজন মুসলিম পুরুষের জন্য একাধিক স্ত্রী রাখা একটি বাধ্যতামূলক বিধান।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামে 'করো' বা 'করো না' অর্থাৎ আদেশ বা নিষেধ সম্পর্কিত বিষয়গুলো ৫টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত। যথা ঃ

১. ফরয বা অবশ্যপালনীয় যা বাধ্যতামূলক।

২. মুস্তাহাব বা অনুমোদিত অথবা উৎসাহিত।

৩. মুবাহ বা অনুমোদনযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য।

৪. মাকরূহ বা অননুমোদিত বা নিরুৎসাহিত।

৫. হারাম বা বে-আইনি অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

এ শ্রেণীবিভাগের মধ্যে 'বহুবিবাহ' বড়জোড় তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। অর্থাৎ বহুবিবাহ ইসলামী বিধানে বিশেষ ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বা বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণযোগ্য। এটা সরাসরি বলা সঙ্গত হবে না যে, মুসলিমের তিন বা চার জন স্ত্রী আছে বরং বলা উচিত; যার একাধিক স্ত্রী আছে তার চেয়ে ঐ ব্যক্তি উত্তম যার আছে একজন স্ত্রী।

মহিলাদের গড় আয়ু বেশি

নারী ও পুরুষের জন্মহার প্রকৃতিগতভাবে প্রায় সমান। ছেলেদের চাইতে মেয়েদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। মেয়েরা রোগ-জীবাণু ও বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির সাথে বেশি লড়াই করতে পারে। এ জন্যই মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মৃত্যুর হার বেশি। এছাড়া যুদ্ধকালীন সময়ে নারীদের তুলনায় পুরুষরাই অধিক হারে নিহত হয়। দুর্ঘটনা এবং বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে নারীদের চেয়ে পুরুষদের মৃত্যু বেশি হয়। পুরুষদের তুলনায় নারীদের গড় আয়ু বেশি এবং যে কোনো যুগে বিপত্নীক পুরুষদের চেয়ে বিধবাদের সংখ্যা অধিক খুঁজে পাওয়া যায়।

banglainternet.com

ভারতে পুরুষের সংখ্যা নারীর অর্ধেক

প্রতিবেশী কয়েকটি দেশের মধ্যে ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে পুরুষ জনসংখ্যার চেয়ে নারী জনসংখ্যা কম। ভারতে উচ্চহারে নারী শিশু হত্যা করা হয়। অভিশপ্ত যৌতুক প্রথার কারণে প্রতিবছর কমপক্ষে দশ লক্ষ নারী শিশুর ভ্রূণ গর্ভপাত করে ফেলা হয়। এ অশুভ প্রবণতা বন্ধ হলে দেখা যাবে যে ভারতেও পুরুষদের তুলনায় নারীদের সংখ্যা বেড়ে গেছে।

বিশ্বে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা বেশি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা ৭,৮ মিলিয়ন অর্থাৎ ৭০ লক্ষ ৮০ হাজার বেশি। শুধুমাত্র নিউ ইর্য়ক শহরে পুরুষদের তুলনায় নারীর সংখ্যা ১০ লক্ষ বেশি এবং এ পুরুষ জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ আবার সমকামী অর্থাৎ এরা কোনো নারীর সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী নয়। সমগ্র আমেরিকায় ২৫ মিলিয়ন অর্থাৎ ২ কোটি ৫০ লক্ষের বেশি সমকামী রয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় এ লোকগুলো কোনো নারীকে বিয়ে করতে আদৌ ইচ্ছুক নয়। অন্যদিকে গ্রেট বৃটেনে পুরুষদের চেয়ে ৪০ লক্ষ নারী বেশি রয়েছে। জার্মানিতে পুরুষদের তুলনায় নারীর সংখ্যা ৫০ লক্ষ বেশি। রাশিয়াতে পুরুষদের চেয়ে নারীর সংখ্যা ৯০ লক্ষ বেশি। সারা বিশ্বে পুরুষদের তুলনায় নারীর সংখ্যা কত বেশি হবে, তা সহজেই অনুমেয়।

'এক স্ত্রী' রাখার বিধান বাস্তবসম্মত নয়

যদি একজন পুরুষ শুধুমাত্র একজন স্ত্রী গ্রহণ করে, তাহলে কেবল আমেরিকাতেই তিন কোটি নারী কোনো স্বামী খুঁজে পাবে না। উল্লিখিত বিধান রাখা হলে অনুরূপভাবে গ্রেট বৃটেনে ৪০ লক্ষ, জার্মানিতে ৫০ লক্ষ এবং রাশিয়াতে ৯০ লক্ষ নারী কোনো স্বামী পাবে না। ধরা যাক, আমার অথবা আপনার কোনো বোন আমেরিকায় বসবাসকারী একজন অবিবাহিতা মহিলা। তার সামনে দুটি বিকল্প আছে- তাকে হয় এমন একজন পুরুষকে বিয়ে করতে হবে যার একজন স্ত্রী আছে অথবা তাকে গণিকাপদে পরিণত হতে হবে। এছাড়া কোনো বিকল্প নেই। যে কোনো রুচিবান নারী প্রথমটিই গ্রহণ করবে। অর্থাৎ একজন স্ত্রী রয়েছে, এমন একজনের দ্বিতীয় স্ত্রী হতে তার আপত্তি থাকবে না।

আজকাল পশ্চিমা সমাজে একজন পুরুষের একাধিক নারীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, অথবা বিবাহ বহির্ভূত যৌনাচার সেখানে একান্তই স্বাভাবিক। আর একারণেই সেখানে নারীরা অতৃপ্ত ও যৌন নিরাপত্তাহীন জীবনযাপন করে। অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকার ব্যাপারকে তারা গ্রহণ করতে পারে না। অথচ একাধিক স্ত্রী প্রথা মেনে নিলে সেখানে নারী তার সমাজে সম্মানজনক ও মর্যাদার জীবন যাপন করতে পারতো।

কাজেই, সেখানে নারীকে এমন দু'টি ব্যবস্থার একটিকে গ্রহণ করতে হবে যে দু'টির কোনো বিকল্প নেই। হয় তাকে একজন বিবাহিত পুরুষকে বিয়ে করতে হবে যার একজন স্ত্রী আগে থেকে আছে, অথবা তাকে গণ সম্পত্তিতে পরিণত হতে হবে। এমতাবস্থায় ইসলাম নারীকে সম্মানজনক প্রথম ব্যবস্থাটাকেই গ্রহণের অনুমতি প্রদান করে, দ্বিতীয় অমর্যাদাকর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি দেয় না। তাই ইসলাম যে সীমিত পর্যায়ে 'বহুবিবাহ'কে অনুমোদন দেয় তার পেছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে। তবে নারীর সম্মান-সম্ভ্রম রক্ষা করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য।

বহুপতি গ্রহণে বিধি-নিষেধ

প্রশ্ন : পুরুষ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারলে নারীকে একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে ইসলাম বাধা দেয় কেন?

উত্তর : ইসলাম যেখানে একজন পুরুষকে একাধিক স্ত্রী রাখার অনুমতি দেয়, সেখানে একজন নারীকে একই অধিকার দিতে অস্বীকৃতি জানায় কেন–আপনার প্রশ্ন? বেশ কিছু লোক যাদের মধ্যে কিছু মুসলিমও রয়েছেন- যারা এ বিষয়ের তাৎপর্য সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, একটি ইসলামি সমাজের ভিত্তি সাম্য ও ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ্ তাআলা নারী ও পুরুষকে সমানভাবে সৃষ্টি করেছেন– তবে সামর্থ্য, যোগ্যতা ও দায়িত্বের ভিন্নতা দিয়ে। নারী ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। কাজের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ও দায়িত্বে ইসলামে নারী ও পুরুষ সমান কিন্তু অভিন্ন নয়।

পবিত্র কুরআন মাজীদের সূরা আন-নিসার ২২ নং থেকে ২৪ নং আয়াতে সেসব গায়ের মাহরাম নারীর তালিকা দেয়া হয়েছে, যাদেরকে বিবাহ করা একজন মুসলিম পুরুষের জন্য নিষিদ্ধ।

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا . حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ

banglainternet.com

وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا . وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

অর্থ ঃ যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না, কিন্তু যা বিগত হয়ে গেছে। এটা অশ্লীল, গযবের কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ। তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা; ভগিনীকন্যা, তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদের স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা–যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোনো গোনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকারী, দয়ালু এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ; তোমাদের ডানহাত যাদের মালিক হয়ে যায়– এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্য সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য– ব্যভিচারের জন্য নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান কর। তোমাদের কোনো গোনাহ হবে না যদি নির্ধারণের পর তোমরা পরস্পর সম্মত হও। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিজ্ঞ, রহস্যবিদ।

অন্য পুরুষের বিবাহাধীন স্ত্রী-ও এ নিষেধের তালিকায় রয়েছে।

একই সাথে একাধিক স্বামী গ্রহণ একজন নারীর জন্য কেন নিষিদ্ধ তার কারণগুলো হলো ঃ

১. কোনো পুরুষের একাধিক স্ত্রী থাকলেও তাদের পরিবারে জন্ম লাভকারী শিশুর পিতা কে তা চিহ্নিত করতে কোনো কষ্ট করতে হয় না। পিতৃ ও মাতৃপরিচয় সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু একজন নারীর একাধিক স্বামী থাকলে সন্তানের মাতৃপরিচয় সহজে পাওয়া গেলেও পিতৃপরিচয় পাওয়া সহজ নয়। ইসলাম মাতা ও পিতা উভয়ের পরিচয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করে। বর্তমানকালে মনোবিজ্ঞানীরা (Psychologist) বলেন, যেসব শিশু তাদের মাতা-পিতার পরিচয় জানে না তারা তীব্র মানসিক যন্ত্রণা ও হীনম্মন্যতায় ভোগে। তাদের শিশুদের মাঝে মনবৈকল্য দেখা দেয়। এ কারণেই দেহ পসারিণী বা পতিতাদের সন্তানদের শিশুকাল সুখময় হয় না। একাধিক স্বামী গ্রহণকারী নারীর গর্ভজাত শিশুদের স্কুলে ভর্তি করতে গেলে নারীকে যদি শিশুর পিতার নাম জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে তাকে দুই বা ততোধিক নাম বলতে হবে। আমার জানা মতে, বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মাতা ও পিতা উভয়কে সনাক্ত করাটা পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব। তাই এ পয়েন্টটি অতীতের জন্য প্রযোজ্য হলেও বর্তমানকালের জন্য প্রযোজ্য না-ও হতে পারে।

২. পুরুষ প্রকৃতিগতভাবে নারীর চেয়ে বহুপত্নীক হওয়ার ব্যাপারে অধিক যোগ্য।

৩. একজন পুরুষ জৈবিক দিক থেকে তার একাধিক স্ত্রীর প্রতি তার কর্তব্য সহজেই পালন করতে পারে। কিন্তু একজন নারীর একাধিক স্বামী থাকা অবস্থায় স্ত্রী হিসেবে তার দায়িত্ব কর্তব্য পালন সম্ভব নয়। একজন নারীকে তার মাসিক ঋতুস্রাবকালীন অবস্থায় ভিন্ন মানসিক ও আচরণগত সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। এ সময় তার মধ্যে মানসিক ও আচরণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

৪. একাধিক স্বামীর স্ত্রীকে একই সাথে কয়েক জনের যৌনসঙ্গী হতে হয়। এ পরিস্থিতিতে তার বিভিন্ন মারাত্মক রোগের শিকার হয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে, যা যৌনাচারের মাধ্যমে তার অন্য স্বামীদের মধ্যেও সংক্রমিত হতে পারে। এমনকি, যদি তার স্বামীদের অন্য কোনো নারীর সাথে বিবাহ বহির্ভূত যৌনসম্পর্ক না-ও থাকে। অন্যদিকে একাধিক স্ত্রীর স্বামীর জন্য এ জাতীয় সংক্রমণের সম্ভাবনা নেই, যদি তার স্ত্রীদের বিবাহবহির্ভূত অন্য কোনো পুরুষের যৌনসম্পর্ক না থাকে।

উল্লিখিত কারণগুলো একজন লোক খুব সহজেই চিহ্নিত করতে এবং বুঝতে সক্ষম। এছাড়াও আরো অনেক কারণ থাকতে পারে, যেজন্য সর্বজ্ঞ সুমহান আল্লাহ নারীদের জন্য একই সাথে একাধিক স্বামী গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

বহুপতি পিতৃপরিচয় সনাক্তকরণে বাধা

প্রশ্ন : ইসলামে পুরুষকে একের অধিক বিবাহ করার অনুমতি দেয়, তবে কী কারণে একজন স্ত্রী একাধিক স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না?

উত্তর : প্রথম বিষয় হলো, আপনাকে প্রথমে মনে রাখতে হবে যে, নারীর তুলনায় পুরুষের যৌন সক্ষমতা বেশি। দ্বিতীয় বিষয় হলো পুরুষ জৈবিকভাবে একাধিক নারীর সাথে শৃঙ্খলার সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে। অপরদিকে একজন নারী শৃঙ্খলার সঙ্গে একাধিক স্বামী ম্যানেজ করতে সক্ষম হবে না।

চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাদের বলে যে, মাসিক চলাকালীন একজন নারী শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের মাঝে কাটায় এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেশিরভাগ ঝগড়া-ঝাটি এই বিশেষ সময়ে ঘটে থাকে। আমেরিকান ক্রাইম রেকর্ড অনুযায়ী আমেরিকার নারীরা যেসব অপরাধ করে তার বেশিরভাগ করে থাকে মাসিক চলাকালীন সময়ে। যদি নারীদের একাধিক স্বামী থাকত তাহলে মানসিক অবস্থার ওপর অধিক চাপ পড়ত, খাপ-খাওয়াতে সমস্যা হতো।

চিকিৎসা বিজ্ঞান আমাদের এটাও বলে যে, যদি একজন স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকে তাহলে তার বিশেষ অঙ্গে ছোঁয়াচে ভাইরাস জন্ম লাভ করে এবং সাথে সাথে এ জীবাণুগুলো অন্য স্বামীর শরীরে ছড়িয়ে পড়ে । যেমন; এইডস এর জীবাণু যেটা এক ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ঘটে না।

ধরা যাক, একজনের একাধিক স্ত্রী এবং তাদের সন্তানাদি আছে তাহলে এক্ষেত্রে মায়েদের সনাক্ত করা সম্ভব। পিতা ও মাতাকে সনাক্ত করা যায় । দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে যদি স্ত্রীর একাধিক স্বামী থাকত তাহলে সন্তানদের মাতাকে সনাক্ত করা যেত; পিতাকে নয়। ইসলাম বংশধারা সনাক্ত করার ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, যদি সন্তানেরা পিতার পরিচয় না পায় তাহলে তারা মানসিক অস্থিরতায় ভোগে। এটাতে সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের বাচ্চারা খুবই দো-টানার মধ্যে জীবনযাপন করে। বাচ্চাকে যদি স্কুলে ভর্তি করার প্রয়োজন হয় এবং এর পিতার নাম জিজ্ঞেস করা হয়, তাহলে তাকে একাধিক নাম দিতে হবে এবং আমরা জানি সমাজে এদেরকে কী বলা হয়।

এরূপ বহু কারণ আছে যে জন্য ইসলামে একাধিক স্বামী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়নি। এর বিপরীতে যে সমস্ত কারণে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে আলোচনা করব। উদাহরণস্বরূপ , স্বামী যদি বন্ধ্যা হয় সেক্ষেত্রে স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না। কেননা কোনো ডাক্তার এ বিষয়ে শতভাগ

banglainternet.com

নিশ্চয়তা দিতে পারে না যে স্বামী পুরোপুরি বন্ধ্যা, এমনকি কেস বন্ধ্যী করানোর পরও কোনো ডাক্তার আপনাকে একথা বলতে পারবে না যে, ঐ ব্যক্তি কখনো পিতা হতে পারবে না। একারণে এ অবস্থায়ও বাচ্চাকে সনাক্ত করার মধ্যে সন্দেহ এসে যায়।

দ্বিতীয় ঘটনাটি এরূপ যে, যদি স্বামী কোনো দুর্ঘটনায় পড়ে অথবা তার কঠিন অসুখ হয়, তাতেও কি স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে পারবে না? একথার বিশ্লেষণ করা যাক। যদি স্বামী অসুস্থ থাকে সে প্রয়োজনীয় ভরণপোষণ দিতে না পারে এবং নিজ বংশ রক্ষার দায়িত্ব পালন করতে এবং স্ত্রীকে পরিতুষ্টি দিতে অক্ষম হয় তখন কী হবে?

প্রথম অবস্থায় যদি বাচ্চা এবং বিবির প্রয়োজন পূরণ করতে না পারে, সে তালাক গ্রহণ করতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে জেনেছি, স্ত্রীর শারীরিক বিষয়ে স্বামীর প্রয়োজন ততটা নয়। এরপরও যদি সে সন্তুষ্ট না হয় তাহলে খোলা তালাক গ্রহণ করতে পারে। এখানে স্ত্রীর জন্য খোলা তালাক গ্রহণ করাই উত্তম। যদি স্ত্রী তালাক নেয়ার সময় সে গর্ভবতী হয়ে থাকে। কিংবা যদি সে মাযুর বা রোগী হয় এ অবস্থায় সে যদি তালাকও নেয় তাহলে প্রশ্ন হলো কে তাকে বিয়ে করবে?

পরিস্থিতির প্রয়োজনে অধিক স্ত্রী গ্রহণ

প্রশ্ন : ইসলামে একজন পুরুষকে সর্বাধিক চারটি বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স) কেনো ১১ জন স্ত্রী গ্রহণ করেছেন? এতে কি তাঁকে উচ্চ যৌন আকাঙ্ক্ষী বলে কটাক্ষ করার সুযোগ থাকে না?

উত্তর : পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার আয়াতে সর্বাধিক ৪ জন স্ত্রী রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআনের অন্যত্র সূরা আহযাবে ৫২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۝

অর্থ ঃ এরপর কোনো নারী আপনার জন্য হালাল নয়। আপনার জন্য এও হালাল নয় যে আপনি (বর্তমান) স্ত্রীদের পরিবর্তে অন্য স্ত্রীগণকে গ্রহণ করেন (অবশ্য পরিবর্তন ছাড়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা বা এদের কাউকে তালাক দেয়া না-জায়েজ নয়।) যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনাকে আকৃষ্ট করে, তবে ঐ সব মহিলা ব্যতীত যারা আপনার মালিকানাধীন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ের ওপর সজাগ নজর রাখেন।

এ আয়াত রাসূল (স)-কে অনুমতি দিয়েছে তার সমস্ত স্ত্রীগণকে রাখতে এবং একই সাথে তাকে নতুন কোনো মহিলাকে বিয়ে করতে, তবে তার অধিকারভুক্ত মহিলাগণ বাদ দিয়ে। এখন যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন কেনো রাসূল করিম (স)-কে নতুন কাউকে বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়নি এবং কেনো তার বর্তমান স্ত্রীদের তালাক প্রদানের কথা বলা হয়নি– তখন আপনি অন্য আয়াতে দেখবেন যেখানে বলা হয়েছে, নবীর স্ত্রীগণ হয় তারা ছিলেন তালাকপ্রাপ্ত নয় বিধবা; কেউ তাদের বিয়ে করতে পারবে না। কেননা তারা 'উম্মুল মুমেনিন' বা 'সকল মুমিনের মা'।

সুতরাং কেউ তাদের বিয়ে করতে পারবে না। আর স্বাভাবিক ব্যাপার হচ্ছে নবী করিম (স) তাদের তালাক দেবেন না। যদি আপনি রাসূল (স)-এর ১১টি বিয়ে নিয়ে বিশ্লেষণ করেন তবে দেখতে পাবেন যে, এগুলো হয় তিনি রাজনৈতিক কারণে, না হয় সমাজ সংস্কারের স্বার্থে করেছেন; তাঁর যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নয়।

নবী (স) এর প্রথম বিয়ে ছিল হযরত খাদিজা (রা)-এর সাথে। তখন খাদিজা (রা) ছিলেন ৪০ বছর বয়স্কা এবং নবীজি ছিলেন ২৫ বছর বয়স্ক। তদুপরি খাদিজা (রা) ছিলেন দু'বারের বিধবা। এখন চিন্তা করুন, তিনি যদি যৌন কামনা পূরণের জন্য বিয়ে করে থাকেন, তবে কেন তিনি তাঁর পনেরো বছর বেশি বয়সের মহিলা বিয়ে করবেন তদুপরি তিনি ছিলেন দুই বারের বিধবা?

আরো ভেবে দেখুন, যতদিন হযরত খাদীজা (রা) জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি কাউকে বিয়ে করেননি। যখন মুহাম্মদ (স)-এর বয়স ৫০ তখন বিবি খাদীজা (রা) মৃত্যুবরণ করেন। কেবল ৫৩ থেকে ৫৬ বছরের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (স) তার অন্য সব স্ত্রী গ্রহণ করেছেন। এখন চিন্তা করুন, তিনি যদি অধিক কামাসক্ত থাকতেন তবে কি তিনি তরুণ বয়সে অন্য সব স্ত্রী গ্রহণ না করে ৫৩ হতে ৫৬ বছর বয়সে বিয়ে করতেন?

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের বলে 'বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের যৌন ক্ষমতাও কমে যায়।' সুতরাং স্বার্থহীনভাবে বলা যায়, অধিক কামাসক্ত বলাটা নবীজির প্রতি এক ধরনের কটূক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। নবী করীম (স)-এর বিয়ে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তিনি খাদিজা (রা) ও বিবি আয়েশা (রা)-এর সাথে। আর বাকি বিয়ে ছিল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হয় সমাজ সংস্কারের স্বার্থে, নয়তো রাজনৈতিক স্বার্থে।

banglainternet.com

আপনি যদি আরো লক্ষ্য করেন তবে দেখবেন, তার স্ত্রীগণের মধ্যে কেবল দুই জনের বয়স ছিল ৩৬-এর নিচে। বাকি স্ত্রীদের বয়স ছিল ৩৬ থেকে ৫০ এর মধ্যে।

এখন আমরা প্রত্যেকটি বিয়ের কারণ উল্লেখ করার চেষ্টা করব। প্রথমেই বলা যায় বিবি যোহায়রিয়া (রা) সম্পর্কে। তিনি ছিলেন তৎকালীন আরবে বেশ শক্তিশালী গোত্র হিসেবে পরিচিত বনু মুস্তালিক গোত্রের সন্তান। এ গোত্রের সাথে মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের শত্রুতা ছিল, তবে কিছুকাল পর তারা ইসলামী বাহিনীর কাছে পদানত হয়। পরবর্তীতে হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁকে বিয়ে করেন। তিনি বিবি যোহায়রিয়াকে বিয়ে করার পর সাহাবীরা বললেন, আমরা কিভাবে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আত্মীয়দের বন্দী হিসেবে রাখি? তারপর সাহাবীরা তাদের মুক্ত করে দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দুই গোত্র বন্ধু হয়ে গেল।

বিবি মাইমুনা (রা) ছিলেন বনী নাজাফ গোত্রপ্রধানের স্ত্রীর বোন যিনি তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য রাসূল (স) প্রেরিত সত্তর জন মুসলিমকে হত্যা করেছিলেন। যখন রাসূল (স) মাইমুনা (রা)-কে বিয়ে করলেন, তখন বনু নাজাফ গোত্র মদিনার নেতৃত্বকে স্বীকৃতি দিল এবং মুহাম্মদ (স)-কে তাদের নেতা হিসেবে মেনে নিল।

একইভাবে তিনি বিয়ে করেন উম্মে হাবিবা (রা)-কে, যিনি ছিলেন মক্কার অন্যতম প্রধান নেতা আবু সুফিয়ানের কন্যা। আর এ বিয়ে মক্কা বিজয়ে অবদান রেখেছিল।

বিবি সফিয়া (রা) ছিলেন প্রভাবশালী ইহুদি নেতার কন্যা। কিন্তু নবী করীম (স) তাঁকে বিয়ের ফলে তিনি মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

হযরত মুহাম্মদ (স) বিয়ে করেছিলেন হযরত ওমরের কন্যা হাফসা (রা)-কে। সাহাবীদের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে তিনি সামাজিক সংস্কারের অংশ হিসেবে বিয়ে করেন তাঁর চাচাতো বোন জয়নব (রা) কে, যিনি ছিলেন তালাকপ্রাপ্তা।

সুতরাং স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (স) এর প্রতিটি বিবাহের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সামাজিক সংস্কার বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তাঁর প্রত্যেকটি বিবাহের ভিত্তি ছিল সমাজের মানুষের মধ্যে তথা গোত্রে গোত্রে ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা; যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য নয়।

মিরাস বা উত্তরাধিকার আইন

প্রশ্ন : উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি বা মিরাসের ক্ষেত্রে ইসলামী আইনে নারীর অংশ পুরুষের অর্ধেক কেন?

উত্তর : মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে যথার্থ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মিরাসি সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত নির্দেশনা রয়েছে। আল-কুরআনের যেসব সূরা ও আয়াতে এ সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা হলো, সূরা বাকারা, আয়াত ১৮০ ও ২৪০; সূরা নিসা, আয়াত ৭-৯, ১১, ১২ ও ১৭৬; সূরা মায়েদা, আয়াত ১০৬-১০৮।

নিচে বর্ণিত সূরা নিসার তিনটি আয়াতে আত্মীয়দের অংশ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে—

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদেরকে আদেশ করেন : এক পুত্রের অংশ দু'কন্যার সমান; তবে যদি শুধু কন্যা থাকে দু'জনের অধিক তা হলে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ। আর যদি কন্যা একজন থাকে তবে তার জন্য অর্ধেক। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকে, তাহলে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের একভাগ পাবে। আর যদি সে নিঃসন্তান হয় এবং তার পিতা মাতাই ওয়ারিস হয়, তাহলে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ-এসবই মৃত ব্যক্তি যে ওসিয়ত করে গেছে তা দেয়ার পরে ও ঋণ পরিশোধ করার পরে। তোমাদের পিতা ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক থেকে কারা তোমাদের নিকটতর, তা তোমরা জানো না– এ ব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন সর্বজ্ঞ হিকমতওয়ালা। (সূরা নিসা ঃ ১১)

banglainternet.com

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ
الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّورَثُ كَلٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَّلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصٰى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۚ

অর্থ ঃ আর তোমরা পাবে অর্ধেক অংশ তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে। যদি তাদের সন্তান থাকে তবে তোমরা তাদের পরিত্যক্ত সম্পদের চার ভাগের এক ভাগ পাবে। এ বন্ধন ব্যবস্থা মৃতের ওসিয়ত পালন ও ঋণ পরিশোধের পর গৃহিতব্য। তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে যদি তোমাদের সন্তান না থাকে। তবে তোমাদের সন্তান থাকলে তারা পাবে তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ। এ সব ব্যবস্থা তোমাদের কৃত ওসিয়ত পূরণ করার ও ঋণ পরিশোধ করার জন্য গৃহিতব্য। যদি ব্যক্তি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন কোনো পুরুষ অথবা নারী হন এবং তাঁর এক বৈপিত্রেয় ভাই কিংবা এক বৈপিত্রেয় বোন উত্তারাধিকারী থাকে, তবে তারা প্রত্যেকে পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। কিন্তু তারা যদি এর অধিক হয় তবে সবাই তিন ভাগের এক ভাগে সমঅংশীদার হবে। এটাও হবে মৃত ব্যক্তির কৃত ওসিয়ত পূরণ করার এবং ঋণ পরিশোধ করার পর; কিন্তু ওসিয়ত যেন কারো জন্য ক্ষতিকর না হয়। এ সব হলো আল্লাহর আদেশ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, অতি সহনশীল। (সূরা নিসা আয়াত ঃ ১২)

পবিত্র আল-কুরআনে বলা হয়েছে–

يَسْتَفْتُونَكَ ۚ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَّلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ

অর্থ : লোকেরা আপনার কাছে মতামত জানতে চায়, তাই আপনি বলে দিন, পিতামাতাহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি সম্বন্ধে তোমাদেরকে আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে জানাচ্ছেন যে, কেউ সন্তানহীন অবস্থায় মারা গেলে এবং তার বোন থাকলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ সে পাবে এবং ঐ বোন যদি সন্তানহীনা হয় তবে তার ভাই তার

ওয়ারিস হবে, আর দুই ভগিনী থাকলে তাদের জন্য তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ থাকবে, আর যদি নর ও নারী হিসেবে ভাই বোন উভয়ই থাকে তবে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান হবে। তোমাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার আশংকায় আল্লাহ বিস্তারিত বিধান দিচ্ছেন। অনন্তর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞান সম্পন্ন। (সূরা নিসা : ১৭৬)

বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিপক্ষ পুরুষের তুলনায় নারী তার মিরাসি সম্পত্তির অর্ধেক পেয়ে থাকে। কিন্তু এটা সকল ক্ষেত্রে নয়। আর যদি মৃত ব্যক্তি পিতা-মাতা ও সন্তান বিহীন হয়ে থাকে এবং তার মাত্র একটি বৈপিত্রেয় ভাই ও একটি বৈপিত্রেয় বোন থাকে, তবে তারা উভয়ে ছয় ভাগের এক ভাগ সম্পত্তি পায়। মৃত ব্যক্তি যদি এমন নারী হয়ে থাকে যার পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন কেউ না থাকে, শুধু স্বামী ও মাতাপিতা থাকে, এ অবস্থায় স্বামী পাবে সম্পত্তির অর্ধেক সম্পত্তি, মা পাবে তিন ভাগের একভাগ ও বাবা পাবে ছয় ভাগের একভাগ। এক্ষেত্রে নারী তার পুরুষ প্রতিপক্ষ তথা পিতার চেয়ে দ্বিগুণ অংশ পাবে। এটা সত্য যে, সাধারণভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের চেয়ে অর্ধেক মিরাস পায়। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে উক্ত বিধানই কার্যকর।

- পুত্রসন্তান যা পায় কন্যা তার অর্ধেক পায়।
- মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকা অবস্থায় স্ত্রী পায় আটভাগের একভাগ, মৃত ব্যক্তি নারী হলে সন্তান না থাকা অবস্থায় স্বামী পায় চার ভাগের এক ভাগ।
- মৃতের সন্তান থাকলে স্ত্রী পাবে চার ভাগের এক ভাগ এবং স্বামী পাবে দু'ভাগের এক ভাগ।
- মৃতের যদি মাতা-পিতা ও সন্তান না থাকে, তাহলে ভাই যা পাবে বোন পাবে তার অর্ধেক।

ইসলামে নারীর ওপর এমন কোনো অর্থনৈতিক বাধ্য-বাধকতা ও দায়-দায়িত্ব নেই, যা ন্যস্ত আছে পুরুষের কাঁধে। বিয়ের পূর্বে নারীর অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান সব কিছুর দায়িত্ব থাকে পিতা ও ভাইদের ওপর। বিয়ের পরে উপরিউক্ত দায়িত্ব বর্তায় স্বামী এবং ছেলেদের ওপর। ইসলাম পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন পূরণের দায়-দায়িত্ব পুরুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। এসব দায়-দায়িত্ব পূরণে তাকে যোগ্য করে তোলার জন্য উত্তরাধিকারে অংশ দ্বিগুণ করে দেয়া হয়েছে। যেমন : এক ব্যক্তি তার এক ছেলে ও এক মেয়ের জন্য এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা রেখে মারা গেল। এ অবস্থায় ছেলে পাবে এক লক্ষ টাকা এবং মেয়ে পাবে পঞ্চাশ হাজার টাকা। কিন্তু পরিবারের সর্বপ্রকার আর্থিক প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পুত্রের ওপর ন্যস্ত।

banglainternet.com

অতএব দেখা গেল সেসব প্রয়োজন পূরণে ছেলেটির প্রায় সব টাকাই খরচ হয়ে যায়। ধরা যাক, তার এক লক্ষ টাকার মধ্যে আশি হাজার টাকাই খরচ হয়ে গেল, তাহলে বাকি থাকল বিশ হাজার টাকা। ফলে দেখা গেল যে, ছেলে এক লক্ষ টাকা পেয়েও তার টিকল মাত্র বিশ হাজার টাকা। অপরদিকে মেয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা পাওয়ার পর কোনো খরচ না থাকায় পঞ্চাশ হাজার টাকাই রয়ে গেল। কেননা তার এ টাকা থেকে কারো জন্য একটি টাকাও ব্যয় করতে হয়নি। এখন যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, একদিকে এক লক্ষ টাকা যার আশি হাজার টাকা ব্যয় হয়ে যাবে, আর অপরদিকে পঞ্চাশ হাজার টাকা যার একটি পয়সাও খরচ হবে না। আপনি কোনটা নেবেন? তাহলে কোনো বোকাও এক লক্ষ টাকা নিতে চাইবে না।

সাক্ষ্যদানে নরনারীর অবস্থান

প্রশ্ন : দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান কেন?

উত্তর : দু'জন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান– এটা সকল ক্ষেত্রে সত্য নয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা সত্য। আল-কুরআনের ন্যূনপক্ষে ৫টি আয়াতে নারী-পুরুষ কারো উল্লেখ ব্যতীত সাক্ষ্যদান সংক্রান্ত আলোচনা এসেছে। তার মধ্যে শুধুমাত্র একটি আয়াতে বলা হয়েছে, একজন পুরুষের সাক্ষ্য দু'জন নারীর সাক্ষ্যের সমান। আর তা হলো সূরা আল-বাকারার ২৮২ নং আয়াত। এটা কুরআন মাজীদের দীর্ঘতম আয়াত। এতে অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এতে বলা হয়েছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى.

banglainternet.com

অর্থ ঃ হে সে সব ব্যক্তিরা, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের লেন-দেন করবে তখন তা লিখে রাখবে। তোমাদের মধ্যে কোনো লোক

যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেয়। অনন্তর সে যেন লিখতে অস্বীকার না করে, সুতরাং আল্লাহ তাকে যেমনটা লেখা শিক্ষা দিয়েছেন, তেমনটা যেন লিখে দেয়। আর ঋণগ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং তার পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে, আর এতে যেন বিন্দুমাত্র কম না করে। কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি মূর্খ হয় কিংবা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে না পারে তবে যেন তার একজন অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। অনন্তর দু'জন সাক্ষী রাখবে তোমাদের পুরুষদের মধ্য থেকে। অতঃপর দু'জন পুরুষ যদি না হয় তবে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষী গ্রহণ করবে। এরা এমন সাক্ষীদের মধ্য থেকে হতে হবে, যাদের তোমরা পছন্দ কর। এর কারণ হলো, ঐ মহিলাদের একজন ভুল করলে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেবে। (সূরা বাকারা : ২৮২)

উল্লিখিত আয়াতে অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে একটি লিখিত চুক্তি করার জন্য দু'পক্ষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং দু'জন সাক্ষী রাখার নির্দেশও দান করা হয়েছে। এতে সাক্ষী দু'জন পুরুষ হওয়াকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। যদি দু'জন পুরুষ সাক্ষী পাওয়া না যায়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে।

ধরে নেয়া যাক, কোনো লোক কোনো বিশেষ রোগের জন্য অপারেশন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তাঁর সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য সে দু'জন অভিজ্ঞ সার্জনের পরামর্শ গ্রহণ করবে। কিন্তু কোনো কারণে সে যদি দু'জন সার্জন খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়, তখন সে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে একজন অভিজ্ঞ সার্জনের সাথে দু'জন সাধারণ এমবিবিএস ডাক্তারের পরামর্শ নেবে।

একইভাবে অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও দু'জন পুরুষ সাক্ষীকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ইসলাম আশা করে যে, নিজেদের পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব পুরুষরাই বহন করবে। যেহেতে অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব পুরুষরাই বহন করে থাকে। তাছাড়া অর্থনৈতিক লেন-দেনের ব্যাপারে নারীদের তুলনায় পুরুষরা অধিক দক্ষ। এটাই আশা করা হয়ে থাকে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে একজন পুরুষ ও দু'জন নারীকে সাক্ষী হিসেবে রাখার পরামর্শ দেয়া হয়েছে যাতে নারীদের একজন যদি ভুল করে অন্যজন যেন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। কুরআনে এক্ষেত্রে 'তাদিল্লা' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ তালগোল পাকিয়ে ফেলা বা ভুল করা। অনেকে এ শব্দের ভুল অর্থ করে যে, এর অর্থ ভুলে যাওয়া। সুতরাং একমাত্র অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রেই একজন পুরুষের সাক্ষীকে দু'জন নারীর সাক্ষ্যের সমতুল্য করা হয়েছে।

যা হোক, ইসলামী আইনের কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন যে, হত্যা মামলায় সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রেও নারীসুলভ দুর্বলতা প্রভাব ফেলতে পারে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নারীরা পুরুষের তুলনায় বেশি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। নারীরা তাদের আবেগপ্রবণতার জন্য হত্যা মামলায় সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে সংশয়িত হয়ে যেতে পারে। এজন্যই ইসলামী আইনে বিশেষজ্ঞগণ হত্যা মামলায় সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে একজন পুরুষের সমান দু'জন নারী সাক্ষী রাখার রায় দিয়েছেন। এছাড়া কুরআনে পাঁচ স্থানে পুরুষ নারী কোনোটা উল্লেখ না করে শুধু সাক্ষ্যদানের বিষয় আলোচিত হয়েছে।

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে উইল প্রস্তুতকালে দু'জন ন্যায়বান ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখা আবশ্যক। সূরা আল মায়েদায় বলা হয়েছে-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ.

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যখন কোনো ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন অসীয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রেখো; যদি তোমরা সফরে থাক এবং তোমাদের মৃত্যুর মুসিবত পৌঁছে যায় তবে তোমাদের ছাড়া অন্য লোকদের মধ্যে থেকে দু'জন সাক্ষী রেখো।

অন্যত্র বলা হয়েছে–

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ.

অর্থ ঃ আর যখন তারা ইদ্দত শেষ করার নিকটবর্তী পৌঁছে যায়, তখন তোমরা তাদেরকে যথারীতি বিবাহবন্ধনে রাখবে। অথবা যথারীতি তাদেরকে ইদ্দত শেষে ছেড়ে দেবে। আর তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে। আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সঠিক সাক্ষ্য কায়েম করবে। এতদ্বারা তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে। (সূরা তালাক : ২)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

banglainternet.com

অর্থ ঃ যারা সতী সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না তাদের আশি বার বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না; এরাই তো সত্যত্যাগী। (সূরা নূর : ৪)

বিশেষজ্ঞ আলিমের অভিমত, একজন পুরুষের সাক্ষ্য দু'জন স্ত্রী লোকের সমান–এ বিধান সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অবশ্য এ মতামত সকলে সমর্থন করেন না। কারণ কুরআন মাজিদের সূরা নূরের একটি আয়াতে আল্লাহ সুস্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, একজন পুরুষের সাক্ষ্য একজন নারীর সমান। যেমন বলা হয়েছে–

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ.

অর্থ ঃ এবং যারা তাদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাদের কোনো সাক্ষী নেই এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহর কসম খেয়ে চারবার এই বলে সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী, (সূরা নূর : ৬)

একক সাক্ষী হাদিসের বিশুদ্ধতায় গ্রহণযোগ্য

হযরত আয়েশা (রা) এর মতে, হাদিসের বিশুদ্ধতায় একক সাক্ষী গ্রহণযোগ্য। ইসলামী আইনে বিশেষজ্ঞদের অনেকেই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেন যে, চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন মুমিন নারীর সাক্ষ্যই যথেষ্ট। ভেবে দেখুন ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের একটি রোযা। সেই রোযার ব্যাপারে মাত্র একজন নারীর সাক্ষ্য মুসলিম জনগোষ্ঠির কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কতক বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেন যে, রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন সাক্ষী এবং রমযানের শেষে ঈদের চাঁদ দেখার ব্যাপারে দু'জন সাক্ষী প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সাক্ষীদের পুরুষ বা না নারী হওয়ার ব্যাপারে কোনো শর্ত নেই।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য অগ্রগণ্য, সেক্ষেত্রে কোনো পুরুষ গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করে যখন সমস্যাটি মহিলাদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন : কোনো মহিলার মৃতদেহের গোসল দেয়ার সাক্ষ্য একজন নারীর পক্ষেই দেয়া সম্ভব। অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সাম্যের ব্যাপারে যে ইসলামে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, তা লিঙ্গ বৈষম্যের জন্যে নয়; বরং তা সমাজে নারী পুরুষের প্রকৃতি ও ভূমিকার পার্থক্যের কারণে।

মুসলমানরা কা'বার পূজারী নয়

প্রশ্ন : মুসলমানরা মূর্তি পূজার বিরোধী, তবে তারা তাদের সালাত আদায়ের সময় কা'বার পূজা এবং কা'বার সামনে মাথা অবনত করে কেন?

উত্তর : কা'বা হলো কিবলা অর্থাৎ সালাত আদায়ের সময় মুসলমানদের যে দিকে ফিরতে হয়, তার দিকনির্দেশক স্থান। লক্ষণীয় বিষয় হলো মুসলমানরা তাদের সালাত আদায়ের সময় যদিও কা'বার দিকে তাদের মুখ ফেরায় কিন্তু তারা কা'বার পূজা করে না। তারা আল্লাহ ছাড়া কারো দাসত্ব করে না। কারো সামনে মাথা নত করার বিধান নেই।

কুরআন মাজীদের সূরা আল-বাকারার ১৪৪তম আয়াতে বলা হয়েছে–

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ

অর্থ ঃ বারবার আকাশের দিকে আপনার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ করেছি; কাজেই এমন কিবলার দিকে আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেবো, যা আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফেরান। আর তোমরা যেখানেই থাকো না কেন সেদিকেই মুখ ফেরাও।

ইসলাম ঐক্যে বিশ্বাসী

মুসলমানরা যখন তাদের সালাত আদায় করতে চাইবে তখন তাদের কেউ হয়তো উত্তর দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করার ইচ্ছে করবে, আবার কেউ হয়তো দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়ে। বিশ্বের সকল মুসলমানকে এক আল্লাহর ইবাদতে চূড়ান্তভাবে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তাদের অবস্থান যেখানেই থাকুকনা কেন তাদেরকে একই কা'বার দিকে মুখ ফেরানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেসব মুসলমান কা'বার পশ্চিম পাশে বাস করে তারা পূর্ব দিকে ফিরে এবং যারা কা'বার পূর্ব পাশে বাস করে তারা পশ্চিম দিকে ফিরে সালাত আদায় করবে। অনুরূপ কা'বার দক্ষিণের লোকেরা উত্তর দিকে এবং কা'বার উত্তরের লোকেরা দক্ষিণ দিকে ফিরে সালাত আদায় করবে। এভাবে তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হবে।

banglainternet.com

কা'বা পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত

মুসলমানরাই সর্বপ্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করার গৌরব অর্জন করে। তাদের অঙ্কিত মানচিত্রে দক্ষিণ দিক নির্দেশিত ওপরের দিকে এবং উত্তর দিকে নির্দেশিত

ছিল নিচের দিকে। কা'বা ছিল কেন্দ্রস্থল। অতঃপর পশ্চিমারা মানচিত্রের ওপরের দিককে নিচের দিকে এবং নিচের দিককে ওপরের দিকে রেখে মানচিত্র অঙ্কন করে। অর্থাৎ তারা উত্তর দিককে ওপরের দিকে নির্দেশ করে এবং দক্ষিণ দিককে নিচের দিকে নির্দেশ করে। আল-হামদুলিল্লাহ, তা সত্ত্বেও বিশ্ব মানচিত্রে কা'বার অবস্থান পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলেই রয়েছে।

তাওয়াফ আল্লাহর একত্ববাদের নির্দেশক

মুসলমানরা যখন কা'বা যিয়ারতে যায়, তখন তারা তাওয়াফ করে অর্থাৎ কা'বাকে কেন্দ্র করে তার চারদিক প্রদক্ষিণ করে। এটা বিশ্বাসের প্রতীক এবং আল্লাহর ইবাদতের প্রতীক। যেহেতু প্রত্যেক বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু মাত্র একটি। কাজেই ইবাদতের যোগ্য সত্তা একমাত্র এক আল্লাহ এটা তাঁরই নিদর্শন।

হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে হযরত ওমর (রা)

পবিত্র 'হাজরে আসওয়াদ' তথা কালো পাথর সম্পর্কে ওমর (রা)-এর হাদীস রয়েছে, যাকে হাদীসশাস্ত্রের পরিভাষায় 'আসার' তথা প্রথা-ঐতিহ্য বলা হয়। হযরত ওমর (রা) ছিলেন মুহাম্মদ (স)-এর প্রসিদ্ধ সাহাবী বা সাথীদের অন্যতম।

সহীহ বুখারী দ্বিতীয় খণ্ড-এর হজ্জ পর্ব, অধ্যায় ৫৬, হাদীস নং ৬৭৫-এ উল্লিখিত আছে যে, ওমর (রা) বলেছেন, "আমি জানি, তুমি একটি পাথরমাত্র, কারো কোনো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা তোমার নেই। আমি যদি রাসূলুল্লাহ (স) কে তোমাকে স্পর্শ করতে (এবং চুম্বন করতে) না দেখতাম তাহলে আমি কখনো তোমাকে স্পর্শ (এবং চুম্বন) করতাম না।

কা'বায় দাঁড়িয়ে আযান দেয়া হতো

রাসূলুল্লাহ (স) -এর যুগে কা'বা ঘরের ওপরে ওঠে আযান দেয়া হতো, অর্থাৎ সালাতের জন্য আহবান জানানো হতো। কেউ যদি অভিযোগ করে যে, মুসলমানরা কা'বার পূজা করে। তাদের জানা উচিত কোনো মূর্তিপূজক এমন নেই যে তার পূজ্য মূর্তির ওপরে উঠে দাঁড়ায়।

মক্কা-মদিনায় সংরক্ষিত প্রবেশাধিকার

প্রশ্ন : পবিত্র শহর মক্কা ও মদিনাতে অমুসলিমদের প্রবেশাধিকার নেই কেন?

উত্তর : কুরআন ও হাদীস দ্বারা সমর্থিত যে, পবিত্র শহর মক্কা ও মদিনায় অমুসলিমদের আইনগতভাবে প্রবেশাধিকার নেই। আলোচনা থেকে বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হবে।

সেনানিবাসে সকল নাগরিকের প্রবেশাধিকার নেই ঃ আমি একজন ভারতীয় নাগরিক। এতদসত্ত্বেও সুনির্দিষ্ট কিছু এলাকায় আমার প্রবেশাধিকার নেই। যেমন ঃ সেনানিবাস। প্রত্যেক দেশেই এমন কিছু স্থান রয়েছে যেখানে দেশের সাধারণ নাগরিকদের প্রবেশাধিকার নেই। কেবল সেসব নাগরিক যারা দেশের সেনাবাহিনীতে তালিকাভুক্ত অথবা যারা প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং যাদের বৈধ অধিকার রয়েছে তারাই সেনানিবাস এলাকায় প্রবেশ করতে পারে। অনুরূপভাবে ইসলাম সমগ্র বিশ্ব এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি বিশ্বজনীন ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা। পবিত্র মক্কা ও মদিনা শহর দুটি হলো ইসলামের সেনানিবাস এলাকা। এখানে প্রবেশাধিকার তাদেরই থাকা উচিত, যারা ইসলামে বিশ্বাস করে এবং যারা ইসলামকে সুরক্ষা করবে সেইসব মুসলমানদের।

একজন সাধারণ নাগরিকের পক্ষে সেনানিবাস এলাকায় প্রবেশাধিকারে কড়াকড়ির বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা অনুচিত ও অযৌক্তিক। সুতরাং মক্কা ও মদিনায় প্রবেশাধিকার সংরক্ষণের বিরুদ্ধে কোনো অমুসলিমের পক্ষ থেকে আপত্তি উত্থাপন করা সঙ্গত নয়।

মক্কা-মদিনায় প্রবেশাধিকার

- কোনো ব্যক্তি যদি নিজ দেশ থেকে অন্যদেশে যেতে চায় তাহলে তাকে প্রথমে সে দেশের ভিসা তথা সে দেশে প্রবেশের অনুমতি লাভের জন্য আবেদন করতে হয়। ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশের অভ্যন্তরীণ বিধি-বিধান ও শর্তাবলি থাকে, যা পূরণ না হলে কর্তৃপক্ষ ভিসা দেয় না।
- ভিসা প্রদানের ব্যাপারে যেসব দেশ খুব কড়াকাড়ি করে, তন্মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অন্যতম। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের কোনো দেশের নাগরিকের ভিসা ইস্যুর ব্যাপারে এ কড়াকড়িটা সবচাইতে বেশি। ভিসা ইস্যুর ক্ষেত্রে বেশ কিছু পূর্ব শর্ত তাদের রয়েছে, যা পূরণসাপেক্ষে ভিসা ইস্যু করা হয়।
- আমাকে একবার সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করতে হয়েছিল। যখন সিঙ্গাপুর পৌঁছি তখন দেখি, তাদের ইমিগ্রেশন ফরমে লেখা আছে 'মাদকদ্রব্য বহনকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড'। আমি যদি সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করতে চাই, তাহলে আমাকে তাদের শর্তাবলি তথা ঐ দেশের আইন-কানুন অবশ্যই মেনে চলতে হবে। আমাকে একথা বলার যুক্তিসঙ্গত অধিকার নেই যে, মৃত্যুদণ্ড একটি বর্বর শাস্তি। আমি যদি তাদের চাহিদা ও শর্তাবলি পূরণ করতে পারি, তাহলেই কেবল আমি তাদের দেশে প্রবেশের অনুমতি পেতে পারি।
- যে কোনো দেশের নাগরিকের পক্ষে মক্কা ও মদিনায় প্রবেশের জন্য পূরণীয় প্রথম শর্ত হলো– তাকে মুখে উচ্চারণ করতে হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অর্থাৎ তাকে মৌখিক স্বীকৃতি দিতে হবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল। মুসলমান হিসেবে ঈমানের এই ঘোষণাই তার ভিসা পাওয়ার তথা প্রবেশের অনুমতি লাভের জন্য প্রথম পূর্বশর্ত।

পশু যবেহ করার ইসলামী পদ্ধতি

প্রশ্ন : মুসলমানরা পশুকে ধীরে ধীরে যন্ত্রণা দিয়ে অত্যন্ত নির্মমভাবে যবেহ করে কেন?

উত্তর : কিছু সংখ্যক মানুষ পশু যবেহ করার ইসলামী পদ্ধতিটি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা করে যাচ্ছে। আমি পশু যবেহ সম্পর্কে একজন শিখ ও একজন মুসলিমের মধ্যকার আলোচনা উল্লেখ করে সমালোচনার জবাব দিতে চাই।

একদা একজন শিখ একজন মুসলমানকে প্রশ্ন করে যে, তোমরা পশুকে গলা কেটে যন্ত্রণা দিয়ে নির্মমভাবে কেন যবেহ কর? আমরা তো এক ঝটকায় পশুর গলা কেটে ফেলি। মুসলমান লোকটি উত্তর দিলেন, 'আমরা অত্যন্ত সাহসী, তাই সামনে থেকে আক্রমণ চালাই। আমরা 'মরদ কা বাচ্চা'। আর তোমরা কাপুরুষ তাই পেছন থেকে আক্রমণ কর।' এটা নিছক একটা হাস্যরসাত্মক গল্প বটে। তবে ইসলামী যবেহ পদ্ধতি যে শুধু মানবিক তা নয়; বরং এ পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক তা নিচের বিষয়গুলো বিবেচনা করলে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

১. পশু যবেহের ইসলামী নিয়ম ঃ ইসলামে পশু যবেহ করা পবিত্রকরণ চেতনার অংশ। এজন্য পশু যবেহের ইসলামী পদ্ধতি অনুসরণ করতে নিম্নোক্ত শর্তগুলো মেনে চলতে হবে।

- **পশু যবেহের হাতিয়ার ধারালো হতে হবে ঃ** পশুকে অত্যন্ত ধারালো ছুরি দিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে যবেহ করতে হবে, যাতে পশুর যন্ত্রণা যথাসম্ভব কমিয়ে আনা যায়।

banglainternet.com

- **গলনালী, শ্বাসনালী ও ঘাড়ের রক্তবাহী নালী কেটে ফেলতে হবে ঃ** 'যাবীহ' আরবি শব্দ, যার অর্থ যবেহকৃত পশু। পশুর গলনালী, শ্বাসনালী ও ঘাড়ের দু'পাশের রক্তবাহী নালী কেটে পশুকে যবেহ করতে হবে। পেছন দিকে মেরুদণ্ডের শিরা কাটা যাবে না।
- **দেহ থেকে রক্ত বের হওয়ার সুযোগ দিতে হবে ঃ** পশুর মাথা আলাদা করার আগে রক্ত সম্পূর্ণরূপে বের করে দিতে হবে। কারণ রক্তই হলো যাবতীয় জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদির আবাস। এজন্য ঘাড়ের শিরা কোনো ক্রমেই কাটা যাবে না। কারণ হৃদযন্ত্রের দিক থেকে যেসব শিরা-উপশিরা রয়েছে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে যেতে পারে। ফলে মাঝ পথে রক্ত আটকে পড়তে পারে।

২. **রক্ত রোগ-জীবাণু ও ব্যাকটেরিয়ার পরিবহন মাধ্যম ঃ** রক্ত হলো রোগজীবাণু, ব্যাকটেরিয়া ও জৈব বিষ ইত্যাদির সহজ পরিবহন মাধ্যম। সুতরাং ইসলামী যবেহপদ্ধতি সবচেয়ে স্বাস্থ্যসম্মত ও বিজ্ঞানসম্মত। কেননা রক্তের মধ্যে রোগজীবাণু, ব্যাকটেরিয়া ও জৈব বিষ বাসা বেঁধে থাকে। রক্ত বের করে দেয়ার ফলে গোশ্ত বা মাংস উল্লিখিত ক্ষতিকর পদার্থ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

৩. **গোশত দীর্ঘ সময় ভালো থাকে ঃ** ইসলামী পদ্ধতিতে যবেহের মাধ্যমে গোশ্ত দীর্ঘসময় পর্যন্ত সতেজ ও ভালো থাকে। কারণ এ পদ্ধতিতে যবেহ করার ফলে অন্যান্য যবেহপদ্ধতির চেয়ে গোশতের সাথে রক্তের পরিমাণ সবচেয়ে কম থাকে।

৪. **জবাইকৃত পশুর ব্যথার অনুভূতি থাকে না ঃ** ধারালো ছুরি দিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সাথে গলনালীগুলো কেটে দেয়ার কারণে মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের সাথে রক্তবাহী শিরার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে ব্যথার অনুভূতি আর থাকে না। কারণ মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলোতে রক্ত প্রবাহই ব্যথার অনুভূতি সৃষ্টি করে। মৃত্যুর সময় পশু যে পাগুলো ছুঁড়ে লাফালাফি করে এবং ছটফট করে তা ব্যথার জন্য নয়; বরং তা পেশিগুলোর সংকোচন ও প্রসারণের কারণে, গোশতের মধ্যে রক্তের ঘাটতি সৃষ্টি হওয়ার কারণে এবং দ্রুতগতিতে রক্ত পশুদেহের বাইরে চলে যাওয়ার কারণে।

আমিষ খাদ্য গ্রহণ

প্রশ্ন : প্রাণী হত্যা করা একটি অমানবিক কাজ। মুসলমানরা আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করে কেন?

উত্তর : বর্তমান সময়ে সচেতন মানুষের মধ্যে নিরামিষ ভোজনের প্রতি বেশী আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। 'নিরামিষবাদ' (vegetarianism) আজকাল বিশ্বব্যাপী একটি আন্দোলন। অনেকে এটাকে পশু অধিকারের সাথে যুক্ত করে। অধিকন্তু বিশ্বে বিপুল সংখ্যক মানুষ আছে যারা মাংস খাওয়াকে পশু অধিকার লঙ্ঘন বলে মনে করে। ইসলাম সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের নির্দেশ দেয়। বিশ্বাসীদের মতে, মানবজাতির কল্যাণের জন্য বিশ্বজগত এবং জগতের উদ্ভিদরাজি ও প্রাণীকুল সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই পৃথিবীর প্রতিটি উদ্ভিদ-প্রাণীই আমাদের কাছে আমানত স্বরূপ এখন এসব আমানত তথা আল্লাহর দেয়া সামগ্রী ন্যায় ও ইনসাফের সাথে ভোগ-ব্যবহার করা মানুষের দায়িত্ব।

মুসলমানদের নিরামিষভোজী হতে বাধা নেই

খাঁটি মুসলমান হয়েও কেউ খাঁটি নিরামিষভোজী হতে পারেন। এতে কোনো সমস্যা নেই। আবার আমিষ জাতীয় খাদ্যগ্রহণ একজন মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। হালাল যে কোনো খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন মুসলমান পুরোপুরি স্বাধীন।

পবিত্র কুরআনে আমিষ খাদ্য অনুমোদিত

আল-কুরআন একজন মুসলমানকে আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণের অনুমতি দেয়। নিচের আয়াত তার প্রমাণ-

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ.

অর্থ : যারা ঈমান এনেছো, তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করবে। তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে চতুষ্পদ জন্তু– (সূরা মায়েদা ঃ ১)

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.

অর্থ : আর তিনি সৃষ্টি করেছেন চতুষ্পদ জন্তু, এতে রয়েছে তোমাদের জন্য শীতের সম্বল, আরো রয়েছে উপকার এবং তা থেকে তোমরা কিছু সংখ্যক খেয়েও থাকো। (সূরা নাহল ঃ ৫)

banglainternet.com

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.

অর্থ : নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে। আর তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে অনেক উপকারিতা এবং তোমরা তাদের ভক্ষণ করে থাকো। (সূরা মু'মিনুন : ২১)

মাংস পুষ্টিকর ও আমিষে পরিপূর্ণ

মাংসই প্রোটিনের উত্তম উৎস। জৈবিকভাবেই এতে আছে প্রচুর প্রোটিন। এমন ৮টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অ্যামিনো এসিড আছে যা শরীর থেকে পূর্ণ হয় না, তা সুষম খাদ্যের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে আয়রন, ভিটামিন বি-১ এবং নিয়াসিন। মাংস সেই সুষম খাদ্যের চাহিদা পূরণে প্রধান নিয়ামক।

মানুষের সর্বভুক দাঁত আছে

ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে, তৃণভোজী প্রাণী যেমন, গরু, ছাগল ও ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীর দাঁতের গঠন একই রকম। অর্থাৎ এসব পশুর দাঁত ভোঁতা ও সমতল যা তৃণ জাতীয় খাদ্য গ্রহণের উপযোগী, অপরদিকে আপনি যদি মাংসাশী প্রাণীদের যেমন সিংহ, বাঘ ও নেকড়ে ইত্যাদি প্রাণীর দাঁত লক্ষ করেন তবে দেখতে পাবেন এসব পশুর দাঁত সুঁচালো ও ধারালো যা মাংস জাতীয় খাদ্য গ্রহণের উপযোগী। এমনিভাবে আপনি যদি মানুষের দাঁতগুলো লক্ষ করেন তাহলে বিস্ময়করভাবে দেখতে পাবেন তাদের দু'প্রকারের দাঁত রয়েছে। তাঁদের যেমন রয়েছে ভোতা দাঁত, তেমনি রয়েছে সুঁচালো দাঁত। অর্থাৎ মানুষের দাঁত মাংস ও তৃণ উভয় প্রকারের খাদ্য গ্রহণের উপযোগী। অতএব মানুষের দাঁত সর্বভুক। যে কেউ প্রশ্ন করতে পারে সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি চাইতেন মানবজাতি শুধু তৃণজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করবে, তাহলে তিনি মানুষকে ধারালো ও সুঁচালো দাঁত কেন দিলেন? এটা স্বাভাবিকভাবেই বোধগম্য হয় যে, তিনি জানেন মানুষকে প্রয়োজনেই আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকারের খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।

মানুষ আমিষ ও নিরামিষ হজমে সক্ষম

দেখা যায়, তৃণভোজী প্রাণীগুলো শুধুমাত্র তৃণজাতীয় খাদ্য হজম করতে পারে। অপরদিকে মাংসাশী প্রাণীগুলো কেবল মাংস হজম করতে পারে। কিন্তু মানুষ নিরামিষ ও আমিষ উভয় জাতীয় খাদ্য হজম করতে পারে। মানুষের খাদ্য

পরিপাকতন্ত্র উভয় ধরনের খাদ্য হজম করতে সক্ষম। সর্বশক্তিমান আল্লাহ যদি তাই চাইতেন যে, আমরা শুধু নিরামিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করি তাহলে তিনি আমাদেরকে আমিষ ও নিরামিষ উভয় ধরনের খাদ্য হজম করার শক্তি কেন দিলেন?

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে আমিষ গ্রহণের অনুমতি আছে

▸ অভ্যাসগতভাবে অনেক হিন্দু নিরামিষ ভোজী। আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণকে তারা তাদের ধর্মবিরোধী বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থসমূহে আমিষ তথা মাংস ভক্ষণের ক্ষেত্রে বাধানিষেধ নেই। ধর্মগ্রন্থসমূহে উল্লিখিত আছে যে, হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীরা আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতেন।

▸ হিন্দুধর্মের নিয়ম-কানুন বর্ণিত গ্রন্থ মনুশ্রুতি'র ৫ম অধ্যায়ের, ৩০ নং শ্লোকে উল্লেখ আছে–

'খাবার গ্রহণকারী সেসব পশুর মাংসই খায়, যা খাওয়া যায়, তবে এতে সে কোনো মন্দ কিছু করে না। এমনকি সে যদি এটা দিনের পর দিনও করে যায়; কেননা ঈশ্বর-ই কতককে ভক্ষিত হওয়ার জন্য এবং কতককে ভক্ষক হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।'

▸ আবার মনুশ্রুতির একই অধ্যায়ের পরবর্তী ৩১ নং শ্লোকে বলা হয়েছে–

'উৎসর্গের শুদ্ধতার জন্য মাংস ভক্ষণ যথার্থ, এটা ঈশ্বরের বিধান হিসেবে প্রচলিত।'

▸ অতঃপর মনুশ্রুতির ৫ম অধ্যায়ের ৩৯ এবং ৪০ নং শ্লোকে বলা হয়েছে–

'ঈশ্বর নিজেই উৎসর্গের উপযোগী পশু সৃষ্টি করেছেন –সুতরাং উৎসর্গের জন্য প্রাণী বধ হত্যা নয়।'

মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ৮৮তম অধ্যায়ে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং পিতামহ ভীষ্মদেবের মধ্যে শ্রাদ্ধের সময় কী খাদ্য পরিবেশন করলে পিতৃপুরুষগণকে সন্তুষ্ট করা যাবে- এ সম্পর্কে যে কথোপকথন হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

'যুধিষ্ঠির বলল, 'হে মহাশক্তিমান প্রভু! আমাকে বলুন, সেসব জিনিস কী কী–যেগুলো পিতৃপুরুষদের শ্রাদ্ধে উৎসর্গ করলে তারা শান্তি পাবে? কী কী জিনিস উৎসর্গ করলে তা স্থায়িত্ব লাভ করবে? আর কী কী জিনিস উৎসর্গ করলে তা চিরস্থায়ী হবে?

ভীষ্মদেব বললেন, 'যুধিষ্ঠির! তুমি আমার কাছে শোনো– যেসব দ্রব্যসামগ্রী শ্রাদ্ধের জন্য উপযোগী ও যথাযথ এবং যেসব ফল-ফলাদি তার সঙ্গে দিতে হবে– সীমের

banglainternet.com

বিচি, চাউল, বার্লি, পানীয় এবং বৃক্ষমূল ও ফলাহার যদি শ্রাদ্ধের সাথে যায় তাহলে হে রাজা! পিতৃপুরুষ এক মাসের জন্য সন্তুষ্ট থাকবে। যদি শ্রাদ্ধে মৎস্য উৎসর্গ করা হয় তাহলে তারা দু' মাসের জন্য সন্তুষ্ট থাকবে। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ভেড়ার মাংস পরিবেশন করলে তারা (পিতৃপুরুষগণ) তিন মাসের জন্য সন্তুষ্ট থাকবে। খরগোশের মাংস দ্বারা চার মাস, ছাগলের মাংস দ্বারা পাঁচ মাস, শুকর মাংস দ্বারা ছয় মাস, পাখির মাংস দ্বারা সাত মাস, হরিণের মাংস দ্বারা তারা আট মাস পরিতৃপ্ত থাকবে। রুরু হরিণ দ্বারা নয় মাস, গয়ালের মাংস দিলে দশ মাস এবং মহিষের মাংস দ্বারা আপ্যায়ন করলে তাদের সন্তুষ্টি স্থায়ী হয় এগারো মাস। গরুর মাংস দ্বারা তাদের সন্তুষ্টি স্থায়ী হয় পুরো একটি বছর। ঘি মিশ্রিত পায়েশ পিতৃপুরুষদের কাছে গরুর মাংসের মতোই গ্রহণীয়। ভদ্রিনাশার (এক প্রকার বড় ষাড়) মাংস দ্বারা সন্তুষ্টি স্থায়ী হয় বার বছর। শুক্ল পক্ষের কোনো দিবসে তাদের মৃত্যু হলে এবং সেই দিবসে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে গণ্ডারের মাংস দ্বারা আপ্যায়ন করতে পারলে তাদের সন্তুষ্টি অক্ষয় হয়ে যায়। 'কালাসকা' নামক সবজি, কাঞ্চন ফুলের পাপড়ি ও লাল ছাগলের মাংস দিতে পারলেও তাদের সন্তুষ্টি চিরস্থায়ী হয়ে যায়।

হিন্দুত্ববাদ অপরাপর ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত

হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থগুলো তাদের অনুসারীদেরকে আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণের অনুমতি প্রদান করে তবুও অনেক হিন্দুই নিরামিষ জাতীয় খাদ্য-গ্রহণকে অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে। কারণ তারা অন্য ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, যেমন ঃ জৈনধর্ম।

উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে

কোনো কোনো ধর্ম খাদ্যাভ্যাসে নিরামিষকে সংযোজন করে নিয়েছে। কারণ তারা জীবহত্যার ঘোর বিরোধী। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকার প্রাণী হত্যা ছাড়া জীবন-যাপন করতে পারেন, তাহলে আমিই এ ধরনের জীবন পদ্ধতি গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি হবো। আগেকার লোকেরা মনে করতো– উদ্ভিদের প্রাণ নেই, তারা প্রাণহীন পদার্থ। কিন্তু আজকাল এটা সার্বজনীন সত্য যে, প্রত্যেকটি উদ্ভিদের প্রাণ আছে। সুতরাং খাঁটি নিরামিষ ভোজী হলেও তাদের জীব হত্যা না করার যুক্তি যথার্থ হয় না।

উদ্ভিদেরও ব্যথা-বেদনা আছে

নিরামিষবাদীরা বলতে পারে যে, উদ্ভিদ ব্যথা অনুভব করতে পারে না। সুতরাং একটি প্রাণী হত্যার চেয়ে উদ্ভিদ হত্যা লঘু অপরাধ। অধুনা বিজ্ঞান আমাদেরকে বলে যে, উদ্ভিদও ব্যথা অনুভব করতে পারে। কিন্তু উদ্ভিদের সেই কান্না মানুষ শুনতে সক্ষম নয়। এটা এজন্য যে, মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয় ২০ হার্টজ থেকে ২০,০০০ হার্টজ-এর মধ্যবর্তী মাত্রার শব্দ শুনতে সক্ষম। ২০ হার্টজ-এর নিচের এবং ২০,০০০ হার্টজ এর উপরের কোনো শব্দ মানুষ শুনতে সক্ষম নয়। একটি কুকুর ৪০,০০০ হার্টজ পর্যন্ত শব্দ শুনতে পায়। তাই কুকুরের জন্য নীরব হুইসেল তৈরি করা হয়েছে যার ফ্রিকোয়েন্সি ২০, ০০০ থেকে ৪০, ০০০-এর মধ্যে। এসব হুইসেলের শব্দ একমাত্র কুকুরই শুনতে সক্ষম। মানুষ এর শব্দ শুনতে সক্ষম না। এ হুইসেলের শব্দ শুনে কুকুর তার প্রভুকে চিনে নিতে পারে এবং প্রভুর কাছে ছুটে আসে। আমেরিকার একজন কৃষি খামারের মালিক অনেক গবেষণা করে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যা দিয়ে উদ্ভিদের কান্না মানুষের শ্রুতিগ্রাহ্য করে তোলা যায়। তিনি বুঝে নিতে পারতেন উদ্ভিদ কখন পানির জন্য কাঁদে। সর্বশেষ গবেষণার ফল হলো, উদ্ভিদ সুখ-দুঃখ অনুভব করতে পারে এবং পারে চিৎকার করে কাঁদতে।

ইন্দ্রিয় সম্পর্কিত প্রাণী হত্যার তর্ক অযৌক্তিক

এক সময়ে নিরামিষভোজীরা যুক্তি দিতেন যে, উদ্ভিদের ইন্দ্রিয় রয়েছে মাত্র দুটো, অথচ প্রাণীদের রয়েছে পাঁচটি। সুতরাং উদ্ভিদ হত্যা প্রাণী হত্যার চেয়ে লঘু অপরাধ। ধরা যাক, আপনার এক ভাই জন্ম থেকেই বোবা ও কানা এবং যে কারণে একজন মানুষের চেয়ে দুটো ইন্দ্রিয় কম পেয়েছে। সে বয়োপ্রাপ্ত হবার পর এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করলো। এখন বলুন, আপনার ভাইয়ের দুটো ইন্দ্রিয় কম থাকার কারণে আপনি কি বিচারককে অপরাধীর সাজা কমিয়ে দেয়ার অনুরোধ করবেন? প্রকৃতপক্ষে আপনি তখন বিচারককে বলবেন যে, হত্যাকারী একজন মাসুম বা নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছে। তাই অপরাধীকে কঠোরতর শাস্তি দিতে হবে। আল-কুরআন ঘোষণা করেছে– يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا অর্থ ঃ হে মানুষ! পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মধ্য থেকে পবিত্র ও উত্তম জিনিসগুলো খাও। (সূরা বাকারা ঃ ১৬৮)

নিরামিষভোজী হলে গবাদিপশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে

মানুষ যদি নিরামিষভোজী হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে গো-মহিষাদীর সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত হারে বেড়ে যাবে। যেহেতু তাদের উৎপাদন অত্যন্ত দ্রুত জ্যামিতিক হারে বেড়ে থাকে। মহান আল্লাহর জ্ঞানের কোনো সীমা পারসীমা নেই। একমাত্র

banglainternet.com

তিনি জানেন সৃষ্টিকুলের মধ্যে কীভাবে ভারসাম্য রক্ষা করবেন। সুতরাং তিনি আমাদেরকে গো-মহিষাদীর মাংস খাওয়ার অনুমতি দান করায় বিস্ময়ের কিছু নেই।

তবে, একশ্রেণীর মানুষ যাঁটি নিরামিষভোজী হলেও আমি তাতে দোষের কিছু দেখি না। তবে আমিষভোজীদের প্রতি তাদের অযৌক্তিকভাবে নিন্দা প্রকাশ কাম্য নয়। তাছাড়া যদি সব ভারতীয় আমিষভোজী হয়ে যায়, তাহলে বর্তমান আমিষভোজীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেননা তখন মাংসের মূল্য অনেক বেড়ে যাবে।

মুসলমানদের আমিষ গ্রহণ

প্রশ্ন : বিজ্ঞান আমাদেরকে বলে, যে যা খায় তার আচরণে সে খাদ্যের প্রভাব পড়ে। অতএব, ইসলাম মুসলমানদের আমিষ জাতীয় খাদ্যের অনুমতি কেন দিয়েছে, যেখানে পশুর গোশত মানুষকে উগ্র ও হিংস্র করে তোলে?

উত্তর : ইসলাম তৃণভোজী পশুর গোশত খাওয়ার অনুমতি দেয় : এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ একমত যে, একজন ব্যক্তি যা কিছু খায়, তার আচরণে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং তার স্বভাব প্রকৃতি সে রকমই হয়ে থাকে। এটাই হলো কারণ যে, ইসলাম মাংসাশী পশুর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করেছে। যেমন : সিংহ, বাঘ, নেকড়ে ইত্যাদি যেগুলো উগ্র ও হিংস্র। উল্লিখিত পশুর মাংসই কেবলমাত্র মানুষকে উগ্র ও হিংস্র করে তুলতে পারে। ইসলাম মুসলমানদেরকে কেবল তৃণভোজী পশুর মাংস খাওয়ার অনুমতি দেয়। যেমন : গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি যেগুলো অত্যন্ত শান্ত, পোষমানা ও নিরীহ প্রাণী। আমরা কেবল শান্ত, নিরীহ ও পোষমানা পশুর গোশতই খেয়ে থাকি। সে কারণেই আমরা শান্তিপ্রিয় ও অহিংস্র।

আল-কুরআনে সূরা আরাফ এর ১৫৭ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ.

অর্থ : তিনি তাদেরকে ভালো কাজের আদেশ দেন এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করেন। তিনি হালাল করেন তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু এবং হারাম করেন যাবতীয় অপবিত্র বস্তু।

পবিত্র কুরআনে আরো ইশরাদ হয়েছে–

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

অর্থ: আর রাসূল তোমাদের যা (নির্দেশ) দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো। (সূরা হাশর : ৭)

আল্লাহ একজন মুসলমানকে কোন্ কোন্ পশুর গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন আর কোন্ কোন্টিতে দেননি এ ব্যাপারে বর্ণিত এ বাণীই যথেষ্ট।

ইসলামে মাংসাশী পশুর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ

সহীহ্ বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম-এর 'শিকার ও যবেহ' পর্বে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে এ ব্যাপারে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সহীহ্ মুসলিম-এর উল্লিখিত পর্বের ৪৭-৫২ নং হাদীস, সুনানে ইবনে মাজাহ'র ১৩শ অধ্যায়ের ৩২৩২ থেকে ৩২৩৪ নং হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) নিম্নোক্ত পশুগুলোর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

- মাংসাশী হিংস্র পশু। অর্থাৎ তীক্ষ্ণ ও ধারালো দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র পশু যেগুলো সাধারণত বিড়াল প্রজাতির। যেমন : সিংহ, বাঘ, বিড়াল, কুকুর, নেকড়ে, হায়েনা ইত্যাদি।
- তীক্ষ্ণ দাঁত বিশিষ্ট ইঁদুর জাতীয় প্রাণী। যেমন : ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর, ধারালো নখ বিশিষ্ট খরগোশ ইত্যাদি।
- সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী। যেমন : সাপ, কুমীর ইত্যাদি।
- ধারালো ঠোঁট ও নখ বিশিষ্ট পাখি। যেমন : কাক, চিল, শকুন, পেঁচা ইত্যাদি।

শূকরের মাংস হারাম

প্রশ্ন : শূকরের মাংস ইসলামে নিষিদ্ধ হবার কারণ কী?

উত্তর : এ কথা সবাই জানে যে, ইসলামে শূকর খাওয়া নিষিদ্ধ। নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে এ নিষিদ্ধের বিভিন্ন কারণ জানা যাবে :

কুরআন মাজীদে শূকর খাওয়া হারাম : কুরআন মাজীদে কমপক্ষে চার জায়গায় শূকরের মাংস ভোগ-ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সেগুলো হলো : (২ : ১৭৩); (৫ : ৩); (৬ : ১৪৫); এবং (১৬ : ১১৫)। আরো বলা হয়েছে–

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ

অর্থ : তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃতপ্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা পশু। (সূরা মায়েদা : ৩)

banglainternet.com

পবিত্র কুরআনের উপরিউক্ত আয়াতটিই একজন মুসলমানের জন্য শূকরের মাংস নিষিদ্ধের কারণ হিসেবে যথেষ্ট।

বাইবেলেও শূকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ ঃ একজন খ্রিষ্টান তার ধর্মগ্রন্থের উদ্ধৃতি থেকে শূকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ বিষয়টি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে পারে। বাইবেলের 'লেভিটিকাস' গ্রন্থে শূকরের মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে–

And the swine, though he divide the hoof, and be cloven-footed, yet he cheweth not the cud, he is unclean to you.

অর্থ ঃ 'আর শূকর যদিও তার খুর দু'খণ্ডে বিভক্ত এবং খুরবিশিষ্ট পায়ের অধিকারী এবং খাদ্য চিবিয়ে খায়, জাবর কাটে না, তবুও ওটা তোমার জন্য নোংরা (অপবিত্র)।'

Their flesh shall,ye not eat, and their carcass shall ye not touch, they are unclean to you [leviticas 11 : 7-8]

অর্থ : 'এগুলোর মাংস তুমি খাবে না এবং এগুলোর মৃতদেহ তুমি কখনো স্পর্শ করবে না, এগুলো তোমার জন্য নোংরা অপবিত্র।' [লেভিটিকাস ১১ : ৭ : ৮]

বাইবেলের 'ডিউটারনমী' গ্রন্থেও শূকরের মাংস খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

And the swine because it divided the hoof, yet cheweth not the cud, it is unclean to you, you shall not eat of their flesh, not touch their deed carcass.

অর্থ : 'আর শূকর কেননা তার খুর দ্বিখণ্ডিত, যদিও চিবিয়ে খায়, জাবর কাটে না, এটা তোমার জন্য নোংরা (অপবিত্র) এগুলোর মাংস তুমি খাবে না, আর না এগুলোর মৃতদেহ তুমি স্পর্শ করবে।' (ডিউটারনমি ১৪ : ৮)

বাইবেলের 'ইয়াইয়াহ' গ্রন্থের ৬৫ অধ্যায়ের ২ থেকে ৫ নং শ্লোকে এ একই নিষিদ্ধতা পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

শূকরের মাংস নানা রোগের কারণ ঃ যথার্থ কারণ, যুক্তি প্রমাণ ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে অমুসলিম ও নাস্তিকরা একমত হতে বাধ্য হবেন যে, একজন ব্যক্তি শূকরের মাংস খাওয়ার কারণে অন্ততপক্ষে ৭০টি বিভিন্ন জটিল ও মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সে বিভিন্ন রকম ক্রিমি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। যেমন : গোলাকার ক্রিমি, সূঁচালো ক্রিমি, বক্র ক্রিমি ইত্যাদি। এদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ক্রিমি হলো টায়েনিয়া সোলিয়াম (Taenia Solium) বা ফিতাক্রিমি।

এটা পেটের ভেতরে অনেক লম্বা হয়ে যায়। এর ডিম রক্ত প্রবাহে ঢুকে পড়ে এবং শরীরের প্রায় সব অংশেই ছড়িয়ে পড়ে। এটা যদি মস্তিষ্কে ঢুকে পড়ে, তবে স্মৃতিভ্রষ্টের কারণ ঘটে। যদি এটা হৃদযন্ত্রে ঢুকে, তাহলে হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ হতে পারে। এটা চোখে ঢুকলে অন্ধত্বের কারণ হতে পারে। আর লিভারে ঢুকে পড়লে লিভার পঁচে যেতে পারে। মোটকথা ফিতাক্রিমির ডিম শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্মক্ষমতা ধ্বংস করে দিতে পারে। এরপর আছে ভয়ঙ্কর ত্রিচুরা টিচুরাসীস' (Trichura tichurasis)। শূকরের মাংস সম্পর্কে একটি সাধারণ ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে এটা যদি ভালো করে রান্না করা হয়, তাহলে এসব ওভা বা ডিম নষ্ট হয়ে যায়। আমেরিকায় এ সম্পর্কে একটি গবেষণা কার্যক্রম চালানো হয় এবং তাতে দেখা যায় যে, ২৪ জন উল্লিখিত রোগীর মধ্যে ২২ জনই শূকরের মাংস ভালোভাবে রান্না করে খেয়েছে। এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, ফিতাক্রিমির এ ডিম বা 'ওভা' রান্নার সাধারণ তাপমাত্রায় বিনষ্ট হয় না।

চর্বি তৈরির উপাদান আছে শূকরের মাংসে ঃ শূকরের মাংসে মাংসপেশী তৈরির উপাদান অত্যন্ত কম, কিন্তু চর্বি তৈরির উপাদান অনেক বেশি। এ জাতীয় চর্বিই শিরা-উপশিরায় জমে উচ্চ রক্তচাপ (হাইপারটেনশন) এবং হার্ট অ্যাটাকের কারণ ঘটায়। এটা আশ্চর্যের কিছু না যে, শতকরা ৫০ ভাগ আমেরিকান হাইপার টেনশনে ভোগে।

শূকর সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রাণী ঃ শূকর পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে নোংরা প্রাণী। এ প্রাণীটি নিজেদের বিষ্ঠা, মানুষের মল খেয়ে থাকে ও অত্যন্ত নোংরা জায়গায় বাস করে। আমার জানা মতে, আল্লাহ তাআলা এ প্রাণীটিকে উত্তম মেথর হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। গ্রামাঞ্চলে যেখানে আধুনিক টয়লেট নেই এবং গ্রামীণ লোকেরা যেখানে খোলা আকাশের নিচে নিজেদের প্রয়োজন সারে, সেখানে শূকর-ই সেগুলো খেয়ে পরিষ্কার করে ফেলে। কেউ যুক্তি দিতে পারে যে, উন্নত দেশগুলোতে আজকাল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন জায়গায় এবং স্বাস্থ্যসম্মত পন্থায় শূকর প্রতিপালন করা হয়। এসব স্বাস্থ্যসম্মত খামারগুলোতেও শূকরগুলোকে গাদাগাদি করেই রাখা হয়। আপনি তাদেরকে যত পরিচ্ছন্নই রাখতে চান না কেন, এ প্রাণী প্রকৃতিগতভাবেই নোংরা। এগুলো খুব আনন্দের সাথে নিজেদের ও সঙ্গীদের বিষ্ঠা ও মলমূত্র চোখ নাক দিয়ে নাড়াচাড়া করে খেয়ে থাকে।

শূকর সবচেয়ে নির্লজ্জ প্রাণী ঃ পৃথিবীর সবচেয়ে নির্লজ্জ প্রাণী হলো শূকর। এটাই একমাত্র পশু যা তার স্ত্রীর সাথে সংগম করার জন্য অন্য সঙ্গীদের ডেকে আনে। আমেরিকার অধিকাংশ অধিবাসী শূকরের মাংস খেতে অভ্যস্ত। যার ফলে

banglainternet.com

বিভিন্ন নৃত্যানুষ্ঠানে তারা অপরের সাথে স্ত্রী বদল করে বিকৃত রুচির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। অর্থাৎ, অনেকে বলে যে 'তুমি আমার স্ত্রীর সাথে ঘুমাও আমি তোমার স্ত্রীর সাথে ঘুমাই।'

আপনি যদি শূকরের মাংস খেতে অভ্যস্ত হন, তাহলে আপনার আচরণও শূকরের মতো হবে। আমরা ভারতীয়রা উন্নত ও রুচিবান হওয়ার জন্য আমেরিকাকে অনুসরণ করি। তারা যা কিছুই করুক না কেন, আমরা তা বেশ কিছু দিন পর্যন্ত অনুসরণ করতে থাকি। আয়লান্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধের মর্ম অনুসারে বোম্বের উঁচুস্তরের লোকদের মধ্যে স্ত্রী বদলের এ ব্যাপারটা নিত্য নৈমিত্তিক ও সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মদপান হারাম

প্রশ্ন : ইসলামে মদপান ও এর ব্যবহার কেন নিষিদ্ধ করা হয়েছে?

উত্তর : সুদূর অতীত থেকেই মানবজাতির ক্ষতির কারণ হিসেবে অ্যালকোহল বা মদকেই দায়ী করা হচ্ছে। এটা অগণিত মানুষের দুর্দশার কারণ। অসংখ্য মানুষের অকাল মৃত্যুর কারণ এবং বিশ্বজুড়ে আতঙ্কজনক দুর্দশার কারণ হিসেবেও চিহ্নিত হয়ে আসছে। সমাজে অনেক সমস্যার মূল কারণ হলো মদপান। পরিসংখ্যানগত দিক থেকে জানা যায়, জঘন্য অপরাধ, ক্রমবর্ধমান হারে মানসিক রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি ভগ্ন সংসার বিশ্বব্যাপী মদের ধ্বংসযজ্ঞের চাক্ষুষ প্রমাণ বহন করছে।

কুরআনে মদপানের নিষিদ্ধতা : আল-কুরআনের সূরা মায়িদার ৯০ নং আয়াতে মদের ভোগ-ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

অর্থ : হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, পূজার বেদী এবং ভাগ্য নির্দেশক তীর- এসব নোংরা অপবিত্র শয়তানের কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং তোমরা এসব থেকে বেঁচে থাকো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।

বাইবেলে মদপানের নিষিদ্ধতা : বাইবেলের নিম্নোক্ত শ্লোকসমূহে মদপানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে–

a. Wine is a mocker, strong drink is raging and whoseover is deceived is not wise.

banglainternet.com

অর্থ : 'মদ হলো প্রতারক, কঠিন পানীয়, যা মন্দ কাজের উদ্দীপক এবং যে এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লো, সে জ্ঞানীর পরিচয় দিল না।' (বাইবেল, নীতিবাক্য ২০ : ১)

b. And be not drink with wine.

অর্থ ; মদ্যপান করে মাতাল হয়ো না।' [এসিয়ানস ৫ : ১৮]

মদপান বিবেকের ভূমিকা বিলুপ্ত করে

মানুষের মস্তিষ্কে একটি বিবেচনা কেন্দ্র রয়েছে, যাকে আমরা বিবেক বলি। বিবেক মানুষকে এমন কাজ করতে বাধা দেয়, যে কাজকে সে মন্দ বলে মনে করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোনো ব্যক্তি মাতা-পিতা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্বোধন করার সময় অশালীন ভাষা ব্যবহার করে না। কারণ তার বিবেক তাকে এটা হতে বাধা দেয়। কেউ যদি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে চায় তার বিবেক তাকে জনসমক্ষে এ কাজ করতে বাধার সৃষ্টি করে, তাই সে টয়লেট তালাশ করে। কেউ যদি মদপান করে, তখন তার বিবেক স্বয়ং অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। মদপানকারীকে অস্বাভাবিক ও অসংলগ্ন আচরণ করতে যে দেখা যায়, তার মূলকারণ এটাই। এমনকি মাতাল ব্যক্তি যখন তার মাতাপিতার সাথে কথা বলে, তখনো সে তাদের সাথে অসম্মানজনক আচরণ করতে থাকে; সে কী করছে তা বুঝতে পারে না। ভালো-মন্দ বিবেচনার শক্তি তার লোপ পেয়ে যায়। মাতাল হয়ে অনেকে নিজের পরিধানের পোশাকে পেসাব করে দেয়। মাতাল অবস্থায় সে ভালোভাবে কথা বলতে বা হাঁটতে পারে না। এমনকি তারা মানুষের সাথে মন্দ আচরণ করে।

অনৈতিকতা ও রোগব্যাধি মদ্যপায়ীদের মধ্যেই বেশি

'আমেরিকান ন্যাশনাল ক্রাইম ভিকটিমাইজেশন সার্ভে ব্যুরো অব জ্যাস্টিস' (US National Crime Victimization Survey Bureau of Justice) এর জরিপ অনুসারে কেবল ১৯৯৬ সালে সেখানে গড়ে প্রতিদিনি ২,৭১৩টি ধর্ষণের ঘটনা রেকর্ড করা হয়। পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ধর্ষক এ ঘটনার সময় মাতাল অবস্থায় ছিল। নারী উৎপীড়নের ক্ষেত্রেও একই প্রতিবেদন পাওয়া যায়।

উক্ত পরিসংখ্যান অনুসারে শতকরা আট ভাগ আমেরিকান তাদের নিকট আত্মীয়কে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত। এমনকি মা, বোন, কন্যাও এদের হাত থেকে রেহাই পায় না। অর্থাৎ প্রতি ১২ কি ১৩ জনের মধ্যে একজন নিকট আত্মীয়কে ধর্ষণের

সাথে জড়িত। এসব ঘটনা তাদের একজনের বা উভয়ের মদপানের ফলে সংঘটিত হয়ে থাকে।

মারাত্মক প্রাণঘাতি রোগ এইডস বিস্তারের প্রধান কারণ মদপান। সুতরাং মদপান একটি মারাত্মক ও প্রাণঘাতি ব্যাধি।

মদপায়ীরা শুরুতে শখ করে মদপান করে

অনেকেই মদপানের পক্ষে নানা যুক্তি দেখাতে চান এবং মদ্যপায়ীদেরকে সামাজিক পানকারী বলে চালিয়ে দিতে চান। তারা বলতে চান যে, তারা কোনো পার্টিতে হয়তো এক চুমুক বা দু'চুমুক পান করেন এবং তারা কখনো মাতাল হন না। তাদের নিজেদের ওপরে নিয়ন্ত্রণ থাকে। দীর্ঘ অনুসন্ধানের ফলাফল থেকে জানা যায় যে, প্রত্যেক মদপায়ীই প্রাথমিক পর্যায়ে সৌখিন পানকারী ছিল। একজন মদপায়ীও শুরু থেকে মাতাল হওয়ার জন্য মদপান শুরু করেনি। এমন একজন সৌখিন মদপায়ীও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে বলতে পারে যে, আমি দীর্ঘদিন থেকেই দু-এক পেয়ালা করে মদপান করে এসেছি, কিন্তু আমি কখনো সীমা ছাড়াইনি এবং মাতাল হইনি।

মদপায়ী মাতাল হয়ে লজ্জাকর কাজ করে থাকে

ধরা যাক একজন সৌখিন মদপায়ী একবার মাত্র নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে। তখন মাতাল অবস্থায় কোনো নারীকে অথবা কোনো নিকট আত্মীয়াকে ধর্ষণ করেছিল। এর জন্য তাকে যদি দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চাইতে হয় এবং ক্ষমা পেয়েও গিয়ে থাকে, তবুও একজন স্বাভাবিক মানুষকে এ লজ্জাকর ঘটনার দুঃসহ স্মৃতি সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হয়। ধর্ষক এবং ধর্ষিতা উভয়কেই এ অপূরণীয় ও অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করে যেতে হয়।

হাদীসে মদপান নিষিদ্ধ

ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ (স) বলেছেন–

- সুনানে ইবনে মাজার ভলিউম-৩ এর ৩০ নং অধ্যায়ের হাদীস নং ৩৬৭১।
'মদই-হলো সকল মন্দের মা তথা মূল এবং এটা সবচেয়ে লজ্জাকর ও মন্দ।'
- উল্লিখিত অধ্যায়ের ৩৩৯২ নং হাদীসে আছে, 'মাদকতা উৎপাদন করে তার বেশি পরিমাণ যেমন নিষিদ্ধ, তার কম পরিমাণও নিষিদ্ধ।'
সুতরাং এক ঢোক বা এক ড্রাম কোনোটাই ক্ষমাযোগ্য নয়।

- শুধু মদ পানকারীর উপরই আল্লাহর লানত তথা অভিশাপ নয়; বরং যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের সহযোগিতা করে, তাদের উপরও আল্লাহর অভিশাপ। হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন–

দশ শ্রেণীর লোকের ওপর আল্লাহর অভিশাপ যারা মদের সাথে জড়িত– ১. যারা চোলাই করে, ২. যার জন্য মদ চোলাই করা হয়, ৩. যে মদ পান করে, ৪. যে মদ বহন করে, ৫. যার জন্য মদ বহন করে নেয়া হবে, ৬. যে মদ পরিবেশন করে, ৭. যে মদ বিক্রয় করে, ৮. যে মদ বিক্রিত টাকা ব্যবহার করে, ৯. যে মদ ক্রয় করে এবং ১০. যার জন্য মদ ক্রয় করা হয়।

মদপানের সাথে নানান রোগ জড়িত

মদপান নিষিদ্ধ করার পেছনে বহু বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে। পৃথিবীতে যেসব কারণে মানুষের মৃত্যু হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু মদপানের সাথে সম্পর্কিত। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ শুধু মদপানের কারণে অকালে ঝরে যায়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বলা আবশ্যক। কেননা, এর কুফল সম্পর্কে সর্বসাধারণ অনবহিত। মদপানজনিত কারণে যেসব রোগ হয়, তার সংক্ষিপ্ত তালিকা দেয়া হলো–

- লিভার সিরোসীস, যাতে কলিজা শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়।
- বিভিন্ন ধরনের ক্ষতরোগ বা ক্যান্সার, খাদ্যনালীর ক্যান্সার, মস্তিষ্কে ক্ষতজনিত প্রদাহ, গলার অভ্যন্তরে ক্যান্সার, লিভার ক্যান্সার (Hepatoma), মল-নালীর ক্যান্সার ইত্যাদি।
- খাদ্যনালী, কণ্ঠনালী, পাকস্থলির প্রদাহ, হজমি শক্তি কমে যাওয়া, যকৃতের প্রদাহ ইত্যাদি রোগ মদপানের কারণে হয়ে থাকে।
- হৃদযন্ত্রের যাবতীয় রোগ যেমন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া, হৃদকম্পন, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদির সাথে মদপানের সম্পর্ক রয়েছে।
- হৃদপিণ্ডের রক্তসঞ্চালন নালীর যাবতীয় রোগ যে জন্য হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, ফিট হয়ে যাওয়া ও গলনালীর প্রদাহ ইত্যাদিও অধিকাংশ মদপানজনিত কারণে হয়ে থাকে।
- বিভিন্ন প্রকার প্যারালাইসিসের অধিকাংশ মদপানের প্রতিক্রিয়ায় হয়ে থাকে।
- মস্তিষ্কের যাবতীয় জটিল রোগ এবং স্নায়ুর যাবতীয় রোগ অধিকাংশই মদপানের কুফল।

banglainternet.com